

শ্রীঅখিল নিয়োগী

দোল-পুশিমা

১৩৩৩

দাম বারো আনা

প্রকাশক :—কুলজা সাহিত্য-মন্দির

—এই লেখকের লেখা—

পরীর দৃষ্টি ৷০

বাম্বা মাঝা ৷০

কলিকাতা ও ঢাকার সকল প্রধান পুস্তকালয়ে

পাওয়া যায় ।

কলিকাতা,

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেনরোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ।

ছ'টী কথা

অনেক বাধা-বিপত্তির পর 'স্বপন-পুরী' বাঙলা দেশের ছোট্ট ভাই বোনদের হাতে তুলে দিয়ে আজ আনার ছুটি।

স্বপন-পুরী তারা হাসিমুখে ঘরে তুলে নেবে কিনা—আজ সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবো না—কিন্তু ঝাঁদের সাহায্য না পেলে আমার এ প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ র'য়ে যেতো—ভাঁদের সম্বন্ধে ছ'টী কথা বলেই আজ আমি বিদায় নিতে চাই।

আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভুল বন্দ্যোপাধ্যায় বই খানার প্রচ্ছদ-পট ও ভেতরকার ছবিগুলো—রেখার টানে চমৎকার কৃতিত্বে তুলেছেন।

প্রথমের তিন রঙা ছবিখানা এঁকে দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষের ছ'খানা একরঙা ছবি বই খানার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আমার নিজের খান দুই ছবিও আছে।

কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র যজ্ঞের যজ্ঞেত্বর হচ্ছেন প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ, যার গাহায্য না পেলে আমার এ স্বপন-পুরীর কল্পনা আদৌ মনে স্থান পেতো না।

সব শেষে আমার নিবেদন এই যে—শেষের ছটি গল্প বিদেশী ভাব থেকে ধার করা এবং দুটাই যথাক্রমে 'শিশুসাধী' ও 'মুকুলে' ইতিপূর্বে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

দোল পূর্ণিমা }
১৩৩৩ }

শ্রীঅখিল নিয়োগী



এই 'স্বপন-পুরী' যিনি তৈরী করেছেন, তাঁকে আমি উদীয়-
মান চিত্র-শিল্পী ব'লেই জান্তাম, এবং তাঁর অঙ্কিত অনেকচিত্র
আমাকে আনন্দ দান করেছে। এখন দেখছি, তিনি শুধু
চিত্র-শিল্পীই ন'ন, কথা শিল্পী-ও।

সুতরাং এই 'স্বপন-পুরী' যে তাঁর মনের মত ক'রে তৈরী
করেছেন, তাঁর কল্পনা যে এই-পুরীকে শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, স্রবমায়,
সত্যসত্যই 'স্বপন-পুরী' করেছে, একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে
পারি।

যাঁরা কথা-সাহিত্য লেখেন, তাঁদের একটা অসুবিধায় পড়তে
হয়, যদি তাঁরা তাঁদের কথাগুলিকে সচিত্র করতে চান। তাঁদের
ধরনা দিতে হয় চিত্র-শিল্পীর ছয়ারে। চিত্র-শিল্পী যদি রসজ্ঞ

হন, তা হ'লে চিত্রাঙ্কনে কথার সৌন্দর্য্য বেড়ে যায়, আর তিনি যদি কথা-শিল্পীর মনের ভাব না বুঝতে পারেন, তা হ'লে অনেক স্থলে শিব গড়তে গিয়ে আর কিছু গড়ে ফেলেন। আমার এ নবীন বন্ধুকে সে বিপদে পড়তে হয় নি,—তিনি নিজে এবং তাঁর শিল্পীবন্ধুরা তুলি ধরে একে মনের মত ক'রে গড়ে তুলেছেন, তাই তাঁর 'স্বপন-পুরী' আমার এত ভাল লেগেছে।

এ কথা কয়টি বলবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না ; কিন্তু আমার এই নবীন বন্ধুটি নাছোড়বান্দা—তিনি তাঁর এই স্বপন-পুরীর সঙ্গে আমার নামটি না জড়িয়ে ছাড়বেন না। সেই জন্যই এই সামান্য দু'টি কথা বললাম।

তাঁর প্রতিভা-ই তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করে দেবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

শ্রী কল্যাণী দেব

প্রিয়তম বন্ধু

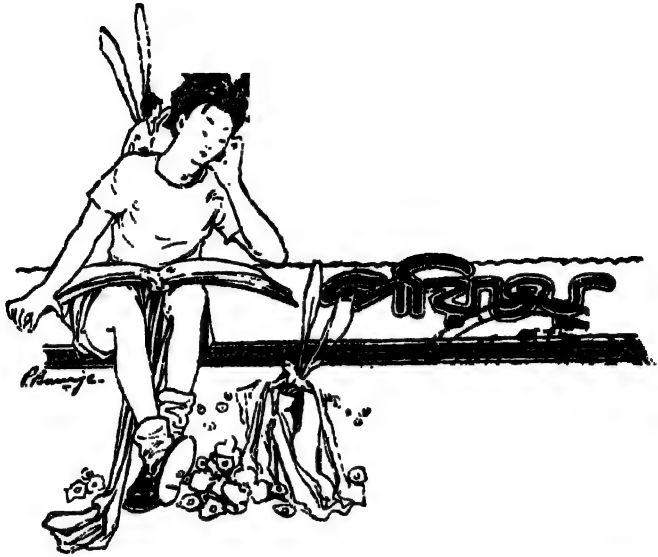
শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্রিয়েষু—

দিলুম বটে তোমায় কালো, আমার গাঁথা স্বপন-পুরী
তোরণ পথের চাবির গোছা আমার ট্যাকেই রাখু মূড়ি ।
তোমার মধুর স্বথের গৃহে দূটবে যখন শিশুর হাসি—
তাদের কোমল হাতের ফাঁকে চাবির গোছা সঁপ্ব আসি ।

তোমার—

অখিল



১। খেতদ্বীপের চামেলা	২৮
২। স্বপন-পুরীর সাথী	৩৮
৩। বাছুরের মেয়ে	৫৫
৪। কপের বরণা	৬৯
৫। সোণার বাঁপি





উপহার

স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর

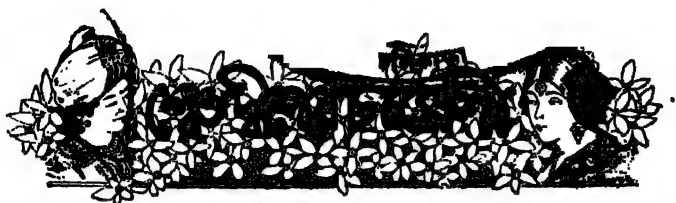
স্মৃতি সন্মানার্থ

পুস্তক সংগ্রহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ত্রিভুজেন্দ্র নাথ বসু ।

1
2



রাজার শুদ্ধু একটি মাত্র ছেলে—অভাব নেই তার কিছুই।
একমাত্র আত্মরে ছেলে ব'লে মুখের কথা খসাতে না খসাতে
তক্ষুণি তা' সামনে এসে হাজির হয়।

কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই—ছেলে বিয়ে ক'রবেনা!
রাজ্য শুদ্ধু লোক কত সাধা সাধি, নাঃ কিছুতেই কিছু নয়—শেষ-
কালে রাজপুত্রের বন্ধু মন্ত্রীপুত্র এসে ধ'রে ব'সল, বন্ধু! বিয়ে
তোমায় ক'রতেই হবে। রাজপুত্র অনেক ভেবে চিন্তে ব'ল্লেন
আচ্ছা, কিন্তু আমার পণ রইল পৃথিবীর সব চাইতে সেরা
সুন্দরীকে পেলেই আমি বিয়ে ক'র'ব তা সে যার মেয়েই
হোক না কেন।

মন্ত্রীপুত্র রাজাকে রাজপুত্রের পণের কথা জানালেন। রাজার
মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; কিন্তু তারপরেই ধীরে ধীরে মাথা
নেড়ে ব'ল্লেন, বড় গুরুতর সমস্যা হ'ল! শুধু রাজকন্যার
কথা হ'লে পৃথিবীর সব রাজাদের কাছে লোক পাঠালেই জানা

স্বপন-পুরী

দেত। কিন্তু রাজার মেয়েই যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী হবে,
তার ত কোনো মানে নেই !

যা হোক ছেলে যখন আমার পণ ক'রেছে তখন সে পণ
যাতে তার বজায় থাকে, আমি তার ব্যবস্থা ক'রছি।

ছুদিন পরেই রাজার বিজ্ঞ মন্ত্রী বেরুলেন দেশ-বিদেশের
পথে পথে,—রাজপুত্রের জন্যে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী খুঁজতে—
সঙ্গে তাঁর অসংখ্য সৈন্য সামন্ত আর লোক লস্কর।

খুঁজতে খুঁজতে মন্ত্রী এক দেশে গিয়ে পৌঁছুলেন—জলের
বদলে, যে দেশের মাঝখান দিয়ে দুধের নদী বইছে আর
কৃষ্ণা বধুরা কলসী ভরে দুধ নিয়ে ঘরে যাচ্ছে।

মন্ত্রী ত দেখে অবাক !

মাঠে চাষারা কাজ করছিল—তিনি একজনকে ডেকে
শুধোলেন, হ্যাঁরে—এদেশের নাম কি ? চাষা বলল দুধরাজার
দেশ। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, রাজপুরী এখান থেকে কত দূর ?

উত্তরে চাষা জানালে—সোজা পূবে চলে যাও—সাত
দিনের পথ। মন্ত্রী, লোক লস্করদের সোজা পূবে যেতে আদেশ
দিয়ে রথে গিয়ে উঠলেন।

রথ ছুট চলল।

প্রথম দিন মন্ত্রী দেখতে পেলেন দুধের নদী চলেছে
কল্কল্‌ ছল্‌ছল করে—টেউ তুলে তুলে,—দ্বিতীয় দিন দেখলেন

স্বপন-পুরী

ছুখের নদী শেষ হয়ে গেছে, আরম্ভ হয়েছে ক্ষীরের নদী, চলেছে সে থগ্‌বগ্‌ করে—তৃতীয় দিন দেখলেন গলা মাখনের নদী চলেছে ফুলে ফেঁপে ঢুকুল ছাপিয়ে। চার দিনের দিন তাও নেই—আছে শুধু ঘিয়ের নদীর ভূটভাট্‌ গড়্‌গড়্‌ শব্দ। উঁচু জায়গা থেকে দলা দলা ঘিয়ের চাপ নীচু জায়গায় পড়তে পড়তে শব্দ কচ্ছিল থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌।

দলা দলা ঘি দেখে তাঁর সঙ্গের সৈন্য সামন্তদের জিভ দিয়ে লাল্‌ গড়াতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল—“হালুয়া পাকায়গা কি রোটি বানায়গা ?

কিন্তু তাদের হালুয়াও পাকাতে হোল না রুটীও তৈরি করতে হোল না—মন্ত্রীর আদেশে তারা শুধু চলেছে আর চলেছে।

পাঁচদিনের দিন তারা দেখলে নদীর নদী তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, চলল তারা এগিয়ে। ছ’দিনের দিন তারা সরস্বতী নদীর ধার দিয়ে সোজা এগিয়ে চললো পূরের দিকে। সাত দিনের দিন অবাক্‌ কাণ্ড !

তারা দেখলে যে—নদীর মুখটা বেরিয়েছে একটা মস্তবড় ছানার পাহাড় থেকে। যে দিকে তাকাও শুধু সাদা—সাদা—সাদা। যেন মস্ত একটা বক্‌ সমস্ত আকাশ-জুড়ে তার পাখি ছড়িয়ে দিয়েছে। আর তার ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে কচ্ছে চিক্‌-চিক্‌-ঝিক্‌-ঝিক্‌ !

স্বপন-পুরী

পাহাড়ের তলায় পৌঁছুতেই ওপর থেকে কে শুধোলে কি চাই আপনার ? মন্ত্রী বল্লেন আমি দুধ রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই ।

হঠাৎ ছানার পাহাড়ের ভেতর দেখা দিলে মন্ত একটা হুড়ঙ্গ । মন্ত্রী তা'র ভেতরে ঢুকে পড়লেন ।

প্রথম খানিকটা খুব অন্ধকার তারপর কিছুদূর যেতেই দেখলেন হুড়ঙ্গের গায়ে বসানো রাশি রাশি মণি মুক্তা, আর তা থেকে আলো বেরিয়েই হুড়ঙ্গটাকে ক'রেছে ঠিক দিনের মতো ।

যেতে যেতে মন্ত্রী গিয়ে উঠলেন সেই কামরায়—যেখানে দুধ রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে প্রজার নিবেদন শুনছেন ।

মন্ত্রী পৌঁছুতেই রাজা তাঁর দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, আপনার এদেশে আসার কথা আগে থেকেই লোক মুখে শুনেছি । বলুন আপনার কি চাই—যার জন্যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করে এদেশে এয়েছেন ।

মন্ত্রী রাজাকে নমস্কার জানিয়ে বল্লেন, মহারাজ আমাদের রাজার ছেলের উপযুক্ত মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে আমি আপনার রাজ্যে এসে পড়েছি ।

রাজা বল্লেন হ্যাঁ—আমার একটা মেয়ে আছে বটে, ঐ একটা মাত্র মেয়ে—তা উপযুক্ত পাত্র পেলে আমার

স্বপন-পুরী

বিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই। তবে মেয়ের একটা পণ আছে।

মন্ত্রী শুধোলেন, তা' বলুন, কি আপনার মেয়ের পণ—
আমি আমাদের রাজপুত্রকে গিয়ে তা জানাবো।

রাজা বল্লেন, খেতদ্বীপের বিক্রম গন্ধর্বেবর এক বাগান আছে,
সেই বাগানে এক রকম চামেলী ফুল ফোটে—যার মধু খেলে
মেয়ে হবে আমার অনন্ত যৌবনা। সেই বাগানের একটা ফুল
আন্তে পারলে তবে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাদের রাজপুত্রের
বিয়ে হ'তে পারে।

মন্ত্রী ব'ল্লেন, বেশ এসব আমি রাজপুত্রকে জানাব।
তবে যাবার আগে মেয়েটাকে দেখে যেতে পারি কি ?
রাজা ব'ল্লেন, নিশ্চয়, এই ব'লে মন্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা করে
দিয়ে তিনি অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন।

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর মন্ত্রী মহাশয় একটু বসে
বসে বিমোচ্ছেন—এমন সময় রাজার কাছ থেকে এক এস্তেলা
এল—এখনি তাঁকে মেয়ে দেখতে যেতে হবে।

মন্ত্রী চল্লেন বাড়ীর ভেতর মেয়ে দেখতে। সেখানে পৌঁছে
দেখলেন—মস্তবড় একটা আরসিকে দাঁড় করান হ'য়েছে আর
তার সামনেই র'য়েছে একটা বহুমূল্য রত্নসিংহাসন।

পৌঁছুতেই দুধ রাজা তাঁকে আদর করে সেই আসনে বসালেন।

শ্বেতবীপের চামেলী—



মন্ত্রী চোখ কহলে নিয়ে আবার দেখলেন ।

স্বপন-পুরী

খানিক পরে একটা মেয়ে তাঁর পেছনে দরজার কাঁকে এসে দাঁড়াল, আর তারি ছবি আরসিতে পড়ে যেন সেটা হেসে উঠল। ইঁা জগতের সেরা সুন্দরী বটে ! মন্ত্রী চোখ কচ্লে নিয়ে আবার দেখলেন। দুধ, ঘি, ছানা, মাখন, ক্ষীর এসবের সার ভাগ নিংড়েই যেন মেয়েটার কমনীয় মুখখানা গড়ে উঠেছে। কি অপূর্ব তার গায়ের রং, আর কি সুন্দর তার গড়ন—চোখ যেন ঝলসে যায়।

মুহূর্ত্ত পরেই মেয়েটা সরে গেল।

মন্ত্রী যেন কোন স্বপ্নলোকের পরীরাজ্য থেকে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

তারপর দুধ রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মন্ত্রী চলে এলেন দেশে।

মন্ত্রীর কাছে সব কথা শুনে রাজপুত্র বল্লেন যাব আমি সেই শ্বেত দ্বীপের চামেলীর সন্ধানে।

রাজা কত বোঝালেন—বাছা ! কাজ নেই তোর চামেলীর সন্ধানে গিয়ে, আমি এর চেয়েও সুন্দরী মেয়ে এনে দোবো। রাণী কত চোখের জল ফেল্লেন—আমার কোল খালি ক’রে তুই কি করে যাবি বাছা !

কিন্তু কিছুই রাজপুত্রকে টলাতে পারলে না, ঐ এক গৌ ধরে বস্লেন—যাবেনই সেই শ্বেত দ্বীপে।

কাজেই রাজা আর কি করেন—সৈন্যদের আদেশ দিলেন

স্বপন-পুরী

তোমরা সব সাজো, রাজপুত্রের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরতে হবে ।

• রাজপুত্র কিম্বৎ বল্লেন, বাবা সঙ্গে আমি কাউকে নেব না—একা বাব আমি চামেলীর সন্ধানে, পথের সাথী হবে শুধু আমার তলোয়ার ।

একদিন সকালে উঠে সমস্ত রাজা কাঁদিয়ে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়লেন । যেতে যেতে রাজপুত্র এমন এক রাজ্যে এসে পৌঁছুলেন যেখানে না আছে মানুষ—না আছে কেউ । কিছু দূর এগিয়ে দেখলেন একটা মস্তবড় রাজপুরী মাথা উঁচু ক’রে দাঁড়িয়ে আছে । রাজপুত্র সাহসে ভর করে তার ভেতর ঢুকে পড়লেন । এ ঘর সে ঘর ঘুরে দেখেন, মানুষের সাড়া শব্দটা পর্যন্ত নেই । রাজপুত্র তারি অবাক হ’য়ে গেলেন—এ সব দেখে । শেষকালে রাজপুরীর পেছনকার ঘরে গিয়ে দেখেন—একটা বুড়ো চুপ চাপ বঁসে আছে খাটের ওপর ।

বুড়োকে দেখে রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে ? কেনই বা এ শূন্য-পুরীতে একলা থাকেন ? বুড়ো খানিকক্ষণ তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে বলল, আমি বুড়ো নই । ঐ যে পুকুর দেখতে পাচ্ছেন ওর এক তাঁচলা জল আমায় খাইয়ে দিন তবেই সব জানতে পারবেন ।

বুড়োর কথা মত রাজপুত্র নিজের উত্তরীয় ভিজিয়ে পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে বুড়োকে খাইয়ে দিলেন । দেখতে দেখতে

স্বপন-পুরী

বুড়ো এক সুন্দর যুবক হয়ে রাজপুত্রের পায়ে ধূলো নিয়ে বসেন, আপনার দয়াতেই আমার জীবন ফিরে পেলাম। সমস্ত জীবন আপনার কেনা হ'য়ে থাকবে।

রাজপুত্র ত ব্যাপার দেখে একেবারে থ'। যুবক শুরু করলেন, আমার নাম বিশ্বকেতু, গলয় দ্বীপের রাজপুত্র আমি। শ্বেত দ্বীপের অদ্ভুত চামেলীর কথা শুনে তারি খোঁজে বেরিয়ে ছিলাম ; গন্ধর্বেবরা আমাকে ধরে এই শূন্য পুরীতে বুড়ো করে রেখেছিল। ঐ বে দুটো পাশা পাশি পুকুর দেখছেন, ওর একটীর জল খেলে লোকে বুড়ো হয়, আর একটীর জল খেলে আগেকার শরীর ফিরে পায়। আপনি ঐ পুকুরের জল খাইয়ে আমার বাঁচিয়েছেন।

রাজপুত্র উত্তরে জানালেন আগিও ত সেই চামেলীর গন্ধানে বেরিয়েছি।

বিশ্বকেতু বলে, কিন্তু সে বড় শক্ত ঠাই—আচ্ছা আমি যতটুকু জানি আপনাকে রাস্তা বাতলে দিচ্ছি। এই শূন্য পুরী ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই আপনি মস্ত বড় একটা পাহাড় দেখতে পাবেন। সেই পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের বাড়ীতে গন্ধর্ব্ব রাজার রাণী থাকেন। তাঁর কাছ থেকে যদি গন্ধর্ব্ব রাজের মৃত্যু-ঞ্জরী কবচটা আদায় ক'রতে পারেন তবে আর আপনাকে কিছু বেগ পেতে হবে না।

স্বপন-পুরী

রাজপুত্র জিজ্ঞেস ক'রলেন, সে কি ক'রে হবে ?

বিশ্বকেতু কিছুক্ষণ ভেবে বল্লেন আচ্ছা, এক উপায় আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমার এই পাশের ঘরে একটা শিবকুণ্ড দেখতে পাবেন। যে যা মনে ক'রে ঐ শিবকুণ্ডের জল খায়—ঘটেও ঠিক তাই।

আপনি এক কাজ করুন, ঐখানে গিয়ে প্রার্থনা করুন—আমি যেন গন্ধর্ব্ব রাজের চাকরের মত হয়ে যাই। চাকরটা তার খুব বিশ্বাসী। তার মতন চেহারা হ'লে রাণীর কাছ থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ আনতে বোধহয় আপনাকে বেশী বেগ পেতে হবে না।

রাজপুত্র গিয়ে ঠিক ঠিক বিশ্বকেতুর কথা মত প্রার্থনা করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চেহারা হয়ে গেল গন্ধর্ব্বরাজের বিশ্বাসী চাকর কুস্তুর মতো। বিশ্বকেতুর কাছে বিদায় নিয়ে রাজপুত্র ছুটলেন তখন গন্ধর্ব্ব রাণীর উদ্দেশে।

রাজপুত্র যখন পাহাড়ের ওপর পৌঁছুলেন, সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে। গন্ধর্ব্ব রাজের পুরীর ভেতর থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল,—রাজপুত্র এগিয়ে চল্লেন।

তোরণ দ্বার দিয়ে পুরীতে ঢোকবার সময় একজন সেপাই ডেকে জিজ্ঞেস কল্লে—কি গো কুস্তদা' যে! মহারাজের খবর কি ? রাজপুত্র হাতের ইসারায় জানালেন—সে সব শোনবার এখন সময় নেই।

স্বপন-পুরী

রাজপুত্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে অন্দরে ঢুকলেন। গন্ধর্ববরাণী বসে বসে তখন অগুরুর ঘোঁয়ায় চুল বাঁধছিলেন। কুন্তকে ছুটে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন কি রে কুন্ত ! খবরকি ?

রাজপুত্র বলেন, মা ঠাকুরুণ সর্বনাশ হ'য়েছে, মহারাজ ভয়ানক বিপদে পড়েছেন—আমায় পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ নিয়ে যেতে। রাণী তক্ষুণি ছুটে গিয়ে হাতীর দাঁতের কোঁটা থেকে কবচটা এনে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বলেন—শিগির যা তুই কুন্ত, মহারাজের প্রাণ বাঁচা।

রাজপুত্রকে তখন পায় কে !—একছুটে বেরিয়ে এলেন গন্ধর্ববরাজের অন্তঃপুর থেকে।

তোরণের সেপাইয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে কোন রকুমে সামলে নিয়ে রাজপুত্র ছুটতে ছুটতে আবার পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছলেন।

এতটা পথ হেঁটে রাজপুত্রের পরিশ্রম হ'য়েছিল খুব, তাই তিনি একটা পাথরের উপরে বসে পড়লেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে চাপা গলায় বলছে—কি করতে হবে রাজপুত্র আমায় বল।

রাজপুত্র চমকে উঠে চারদিক্ তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে দেখলেন—কিস্ত কই—কেউ নেই ত !

ধীরে ধীরে এসে তিনি আবার পাথরের ওপর বসলেন।

স্বপন-পুরী

কে যেন আবার ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল—রাজপুত্র ভয় নেই, আমাকে সব খুলে বল ; আমি তোমার সাহায্য করব।

রাজপুত্র তখন চেয়ে দেখলেন, হাতের মুঠোর ভেতর থেকে গন্ধর্ব্ব রাজের মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ এই সব কথা বল্চে।

রাজপুত্র বল্লেন, আগে ত আমার চেহারা ফিরিয়ে দাও তারপর অণু কথা। বল্চে বল্চেই তিনি তার আগেকার চেহারা ফিরে পেলেন।

কবচটা হাতে পরে রাজপুত্র তাকে শুধোলেন—আচ্ছা বল ত কি করে আমি শ্বেত দ্বীপের চামেলী ফুল পাবো ?

উত্তরে কবচ বল্লেন, সে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। এখন তোমায় আমি সোজা নিয়ে যাব ভৈরবী মায়াবিনীর কাছে। তোমায় সে, তার মস্তুর জোরে এমন ক’রে দেবে যে গন্ধর্ব্ব রাজ তোমার গায়ে হাতটি পর্য্যন্ত দিতে পারবে না।

যেমনি একথা বলা—রাজপুত্র অমনি উড়ে চল্লেন আকাশ পথে হু-হু করে।

রাত্রির বেলা, দিব্য ফুটফুটে জ্যোৎস্না—আর নদীর জলে তারই আলো পড়ে কছে চিক্ মিক্—ঝিক্ মিক্।

বাতাসের দোল খেতে খেতে চাঁদের আলো আর তারার চিক্ মিক্ ভেতর দিয়ে রাজপুত্র ঝড়ের-ঝাপটা-খাওয়া-পাখীর মত ছুটে চল্লেন।

স্বপন-পুরী

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। রাজা সাড়ী পরে কে যেন পূব আকাশে আবির ছিটিয়ে দিয়ে গেল—ঠিক্ এমনি সময় রাজপুত্র ভৈরবী মায়াবিনীর বাড়ীতে গিয়ে হাক দিলেন—ও মাসী, ও ভৈরবী মাসী—বাড়ী আছ গা ?

ভৈরবী মায়াবিনী লাঠিতে ভর দিয়ে তার ছোট্ট কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুধোলে কেগো বাছা কে আমায় ডাক্ছ ?

রাজপুত্র উত্তর দিলেন এই যে আমি গো মাসী—আমি।

ভৈরবী দেখলে কার্তিকের মত একটা ছেলে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাক্ছে।

ভৈরবী জিজ্ঞেস কল্লে—তা বাছা কিসের জন্তু আমার এখানে এয়েছ তুমি ? রাজপুত্র তখন ধীরে ধীরে ভৈরবীকে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে ফোকলা দাঁতে ফিক্ করে হেসে মায়াবিনী বল্লে, তা বাছা তুমি আমার বোনপো তোমার জন্তু এ-কর্ব না ত কর্ব—কার জন্তে। এই বলে ঘর থেকে একটা কৌটো নিয়ে এসে, তা থেকে কালো কালো এক রকম ওষুধ বের ক’রে রাজপুত্রের চোখে কাজল পরিয়ে দিলে।

রাজপুত্র শুধোলেন এতে কি হবে মাসী ? আর একগাল হেসে মাসী রাজপুত্রের হাত ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। রাজপুত্র জলের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলেন জলে তার ছায়া পড়েনি। ভৈরবী বল্লে—দেখলে বোনপো তোমায় এমনভর

শ্বেতদ্বীপের চামেলী—



মায়াবিনী বলে, তোমার জন্মে করবো না ত'
করবো কার জন্মে ?

স্বপন-পুরী

করে দিয়েছি যে কেউ তোমায় দেখতে পাবে না অথচ তুমি সবাইকে দেখতে পাবে। রাজপুত্র আবার তখন চামেলীর সন্ধানে উড়ে চলেন। যেতে যেতে কবচকে শুধোলেন, কবচ, শ্বেত দ্বীপটা দেখতে কেমন বল দেখি ?

কবচ্ হেসে বলল ওঃ তাও জান না—দ্বীপটা আগাগোড়া সাদা প্রবালের তৈরী, তাই তার নাম হয়েছে শ্বেত দ্বীপ। আর বে চামেলী বাগানে আমরা যাচ্ছি তা, পাহারা দেয় কে জান ? রাজপুত্র বললেন কে ? মুচকি হেসে কবচ বলল, গন্ধর্বরাজ নিজে। রাজপুত্র শুধোলে কি করে তা'হলে চামেলী পাব ? কবচ্ বলল, চলত আগে তারপর দেখে শুনে একটা বুদ্ধি বাতলানো যাবে।

সন্ধ্যা হব হব ঠিক এমনি সময় ভারা শ্বেতদ্বীপে গিয়ে পৌঁছুলেন। তখন থেকে সন্ধ্যা-তারাটি মিট-মিট ক'রে সারা আকাশ পাহারা দিচ্ছিল।

সামনেই একটা বড় বটগাছ। কবচ বলল রাজপুত্র আজকের রাতটা এই গাছের ওপরই কাটিয়ে দেওয়া যাক—কি বল ? রাজপুত্র বলল মন্দ কি !—বলে গাছে উঠল।

সকাল বেলায় যখন তার ঘুম ভাঙল, গাছে গাছে তখন পাখী ডাকছে। সকালের সোণালী আলো পড়ে প্রবালের দ্বীপটা যেন জ্বলছে।

স্বপন-পুরী

কবচ বল্লৈ যাও রাজপুত্র, নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে এস।
কবচের কথামত হাত মুখ ধুয়ে রাজপুত্র যেমনি ওপরে উঠেছে,
যমদূতের মত এক যক্ষ, রাজপুত্রের হাত চেপে ধরে বল্লৈ চল
তোমায় যক্ষরাজের কাছে যেতে হবে। রাজপুত্র চম্কে তার
মুখপানে চেয়ে দেখলেন,—বার মত চেহারা করে তিনি যক্ষ-
রাণীর কাছ থেকে কবচ আদায় করেছেন এ সেই কুস্ত।

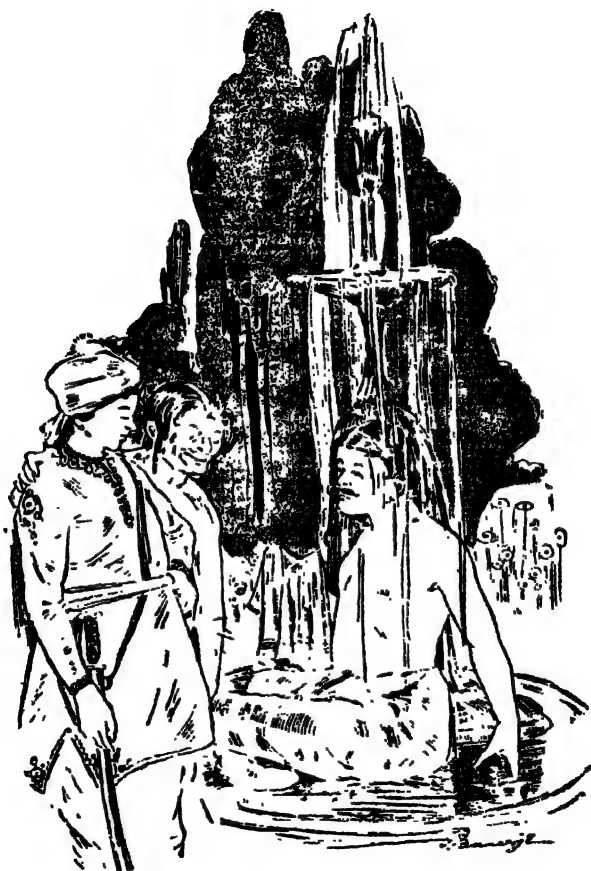
রাজপুত্র ফিস্‌ফিস্‌ করে কবচকে শুধোলে, কুস্ত কি করে
আমায় দেখলে, নায়াবিনীর কাজল ত আমার চোখে আছে।

কবচ জবাব দিলে আমারই ভুল হয়েছিল। তোমায় যখন
মুখ ধুতে বল্লুম ওষুধ তক্ষুণি সব ধুয়ে গেছে। আচ্ছা চলতো,
কি হয় দেখা যাক, আমি ত তোমার সঙ্গেই রইলুম।

কুস্ত যখন রাজপুত্রকে নিয়ে যক্ষরাজের কাছে পৌঁছুল,
—তখন সে গোলাপজলের ফোয়ারার নীচে বসে স্নান করছিল।
রাজপুত্রকে দেখে গোঁফ চুম্ড়ে গস্তীর স্বরে বল্লৈ, আমার
বাগানের চামেলী চুরি করতে এসেছ? কুস্ত যাও ত, একে
গারদে বন্ধ করে রাখে।

রাজপুত্র গারদে বন্দী হলেন। ছপুর রাত্তিরে চুপি চুপি
রাজপুত্রকে ডেকে কবচ বল্লৈ শিল্লির ওঠ, এখন আমাদের
পালাতে হবে, রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে লাফিয়ে উঠে বল্লেন
পালাতে হবে?—কি করে পালাবো?

শ্বেতদ্বীপের চামেলী—



বন্ধরাজ বলে—কুন্ত, একে গারদে বন্ধ করে রাখ।

স্বপন-পুরী

কবচ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, চুপ—কথাটি নয়। রাজপুত্র তেমনি নীচু গলায় শুধোলেন, কি করতে হবে এখন ?

কবচ চুপি চুপি বলে, পাহারাওয়ালারা সব ঘুমিয়েছে, এখন আর কোন ভয় নেই। আমি তোমায় ছোট্ট পাখিটা করে দিচ্ছি—ফুডুং করে বেরিয়ে পড় তুমি জানালার ফাঁক দিয়ে।

দেখতে দেখতে রাজপুত্র একটা বুলবুলি পাখী হ'য়ে গেলেন, আর জানালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন শব্দ ক'রে কিচ্-কিচ্।

গারদ থেকে বেরুতেই কবচ তাঁর কানে কানে বলে, রাজপুত্র শিল্পীর উড়ে চল তুমি চামেলী বাগানে—আমি তোমায় রাস্তা বাতলে দোবো। এই রাত থাকতে নিতে না পারলে, তোমার পালানর খবর পেয়ে রাজা সাবধান হবে।

নিঝুম রাত, আকাশের তারাগুলো চিক্‌চিক্‌ কচ্ছে, সমস্ত শ্বেত দ্বীপটা যেন কোন স্বপনপুরীর মরণ কাঠির পরশ পেয়ে নীরব নিথর হ'য়ে আছে।

রাজপুত্র উড়ে চলেন কবচ দেখানো পথে,—সেই চামেলী বাগানের উদ্দেশে।

উড়ে-চলা-পথে যেতে যেতে রাজপুত্র দেখতে পেলেন দূরে খানিকটা জায়গা আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। কবচ বাতলে দিলে ওইটে হচ্ছে—সেই চামেলী বাগান।

রাজপুত্র শুধোলে এত আলো কেন ? কবচ হেসে বলে—

স্বপন-পুরী

ওঃ ছাই তাও বুঝি জান না ? আলো যে বেরুচ্ছে সেই চামেলী থেকেই ।

বাগানের কাছে গিয়ে রাজপুত্র নেমে পড়লেন একটা চামেলী গাছে ।

সত্যিই তো ! বাগানটা চামেলী গাছে ভরা, আর লাখে লাখে ফোটা চামেলী থেকে আলো বেরিয়ে জায়গাটাকে ক'রেছে যেন চাঁদের-আলো-জ্বালা-আকাশের মতো ।

কবচ রাজপুত্রের কাণে কাণে নল্ল শব্দ করোনা, গাছের নীচে যক্ষরাজ ঘুমুচ্ছে—চট্ ক'রে একটা চামেলী ঠোঁটে নিয়ে পালিয়ে এসে ।

রাজপুত্র ব'লে শুদ্ধ একটা চামেলী নেবো ? কবচ, আমায় মানুষ করে দাও, আমি আঁচল ভরে চামেলী তুলি—
কবচ ধমক দিয়ে ব'লে, চুপ যক্ষরাজ জাগুলে মারা যাবে যে !

কাজেই রাজপুত্র আর কি করেন ? একটা চামেলী ঠোঁটে ক'রে নিয়ে উড়ে চলেন—নিজের দেশের দিকে ।

তারপর ?

তারপর আর কি ! বরের পোষাক পরে লোক-লস্কর নিয়ে রাজপুত্র চলেন দুধরাজার দেশে, আর লোক-লস্করেরা সেখানে হালুয়া খেলো আর রোটা পাকালো যত তাদের খুসী ।





রাজ্য শুদ্ধ লোক তো শুনে একেবারে থ! রাজকন্যা নাকি পণ করেছে স্বপ্নে-দেখা রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

রাণী বল্লেন, কি করে তার দেখা পাবি মা? স্বপ্নের দেখা কখনো সত্যি হয়?

রাজকুমারী কঁাদ কঁাদ হয়ে বল্লেন—তঁার দেখা আমি পাবই। একদিনই তো শুধু দেখিনি আমি তাঁকে? স্বপ্নপুরীতে অনেক দিন থেকেই যে তাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা।

রাণী শুধোলেন—তবে কি করে তার দেখা পাবি?

রাজকুমারী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, একটীবার শুধু আমায় ছেড়ে দাও মা। আমি একবারটি দেখি দেশে দেশে খুঁজে তাঁকে পাই কি না।

স্বপনপুরীত সাথী—



রাজকুমারী বলেন—স্বপনপুরীতে অনেকদিন থেকেই
যে তাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা ।

স্বপন-পুরী

রাণী বল্লেন—মহারাজ কি তাতে রাজী হবেন ? রাজকুমারী বল্লেন—তুমি একবারটি বুঝিয়ে বল্লেনই হবে ।

রাণী বল্লেন আচ্ছা, একবার বলে দেখি । রাজা সব শুনে বল্লেন, সে কি করে হবে ? ও একা একা যাবে কোথায় ?

রাণী বল্লেন—তা ওর সঙ্গে জনা চারেক দাসী যাক, মন্ত্রী মশায় যান—আর সৈন্য সামন্ত যা হয় কিছু পাঠিয়ে দাও ।

শেষকালে রাণীর কথাই বাতাল রইল । বিশ্বাসী বুড়ো মন্ত্রীর সঙ্গে জনা চারেক দাসী আর পেছনে দলে দলে সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজকুমারী গিয়ে রথে উঠলেন ।

এ দেশ সে দেশ ঘোরার পর যখন কিছুতেই সে রাজপুত্রের সন্ধান মিলল না—তখন মন্ত্রী একদিন রাজকুমারীর কাছে গিয়ে বল্লেন—মা, অনেক দেশই তো দেখলে, কৈ তার সন্ধান পেলো কি ? স্বপ্নের কথা কি মা কখনো সত্য হয় ?

রাজকুমারী বল্লেন—না জ্যাঠা মশায়, আপনি সৈন্যদের বলুন—আরও এগিয়ে যেতে হবে । তাঁকে পেতে আমায় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যদি যেতে হয় তাও আমি যাব ।

মন্ত্রী মশাই আর কি করেন ! রথ দিনকে দিন এগিয়ে চলো ।

একদিন ঠিক দুপুর বেলা রাজকুমারীর রথ মন্তবড় এক বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল । হঠাৎ রাজকুমারী দেখতে পেলেন—

স্বপন-পুরী

বাজারের মাঝখানে একটা লোক টাড়া দিয়ে কি চেষ্টায়ে
বল্ছে—আর তাকে ঘিরে লোক জমেছে বিস্তর ।

রাজকুমারী দাসীকে ডেকে বল্লেন, দাসী, রথ থামাতে বল ।
বাজারে টাড়া দিয়ে কি বল্ছে আমি শুনবো ।

রাজকন্যার আদেশ জানাতেই রথ থামলো ; একজন সৈনিক
গিয়ে টাড়া ওয়ালাকে রথের কাছে নিয়ে এলো— ।

টাড়াওয়ালা টাড়া বাজিয়ে শুরু করে দিলে ;—

আমাদের রাজপুত্রকে এক দৈত্য এসে শিকল দিয়ে পাহাড়ের
ওপর বেঁধে রেখে গেছে ; কেউ সে শিকল খুলতে পারে নি ।
রাজপুত্র বলেছেন, যদি কেউ সেই পাহাড়ের নীচেকার সমুদ্র থেকে
এক ডুবে মৎসরাণীর মাথার পদ্মরাগ মণি এনে এই শিকলে
জোঁয়াতে পারেন—তবেই শিকল খুলবে ।

এখন সেই পদ্মরাগ মণি যে এনে দেবে মহারাজ তাকে
অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দেবেন । সব শুনে রাজকন্যা
বল্লেন—আমি সেই রাজপুত্রকে দেখবো ।

মন্ত্রী বল্লেন—তাকে দেখে কি হবে মা ? আর সে কোথায়
কোন পাহাড়ে আছে কে জানে ?

রাজকুমারী বল্লেন, কেন ? ঐ টাড়াওয়ালাকে ডাকুন না ;
ওর কাছেই সব খবর জানা যাবে । টাড়াওয়ালাকে কাছে রাখ্তার
খবর জেনে নিয়ে রথ আবার ছুটল সেই পাহাড়ের পথে ।

স্বপন-পুরী

পাহাড়ের নীচে গিয়ে রথ থামল। সকলকে সেইখানে অপেক্ষা কস্তে বলে মন্ত্রী, রাজকুমারীকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠলেন।

তঁারা দেখলেন যেন চাঁদের আলো জমিয়ে তৈরী একটা ফুট ফুটে ছেলেকে মস্ত বড় একটা গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছেলেটা ছট্ ফট্ কচ্ছে আর সতৃষ্ণনয়নে চারদিকে তাকিয়ে কার যেন অপেক্ষা কচ্ছে।—রাজকুমারী রাজপুত্রের দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন—এই না তার স্বপনপুরীর চেনা বন্ধু—

যার জন্তে তিনি দেশবিদেশের পথে পথে ঘুরে মরছেন !

রাজকুমারীকে দেখে রাজপুত্রের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন, এই যে তুমি এসেছ—আমি যে তোমারই পথ পানে চেয়েছিলাম।

রাজকুমারী তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বল্লেন—ওগো তোমার জন্তে আমি কত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু এ বেশে তোমায় প্রথম দেখা যে আমি কিছুতেই সহিতে পাচ্ছিনি !

রাজপুত্র হাসতে হাসতে বল্লেন—পদ্মরাগমণি আনলেই তো আমার বাঁধন খুলে যাবে ! রাজকুমারী মাথা তুলে বল্লেন—হ্যাঁ এক্ষুণি আমি যাব পদ্মরাগ মণি আনতে—কিন্তু আনতে পারব কি ? তুমি আমার মনে বল দাও !

অপন-পুরীস সাথী-



রাজপুত্র বলেন—আমি যে তোমারই
পথ পানে চেয়েছিলাম ।

স্বপন-পুরী

রাজপুত্র রাজকুমারীর চোখের ওপর চোখ রেখে বলেন—তুমি নিশ্চয়ই পারবে। তোমার আশায়ই যে আমি দিন গুণ্ছিলাম।

রাজপুত্রের পায়ের ধূলো নিয়ে রাজকুমারী পাহাড়ের ওপর থেকে সমুদ্রের বুকে বাঁপিয়ে পড়লেন।

বুড়ো মন্ত্রী হা-হা করে উঠলেন !

রাজকুমারী এক ডুবে পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন—লাখো লাখো মণিগুক্তো সমুদ্রের তলাটার গায়ে যেন টাঁদের আলো মাখিয়ে দিয়েছে। একটা ছোট লাল-মাছ চেউয়ের ভেতর দিয়ে ছলে ছলে তার কাণের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে শুধোলে—কোন দেশের মেয়ে গা তুমি—কি চাই তোমার ?

রাজকুমারী অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বলেন, আমার বাড়ী অনেক ওপরে। তোমাদের রাণীর সঙ্গে দেখা হয় কি করে বলতে পার ? একরহি মাছটি তার ছোট্ট লেজ দিয়ে জল নাড়িয়ে বলে—তা আর কি ? আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি রাণীমাকে।

খানিক বাদে মাছটি ফিরে এসে বলে, রাণীমা শুধোলে, তুমি কোন দেশের লোক গা ?

রাজকুমারী বলে—আমি মানুষের দেশের লোক। মাছটি দুধারের জল ঢলকে দিয়ে খবর নিয়ে ছুটে গেল। আবার একটু

স্বপন-পুরী

বাদেই ফিরে এসে বলল, রাণীমা বললেন—মানুষের দেশের লোককে বিশ্বাস নেই—তারা সব কস্বে পারে। তবে যদি তুমি একমাস রাণীমার দাসীর কাজ কস্বে পার তবেই তাঁর দেখা পাবে।

রাজকুমারী তাতেই রাজী—! রাজপুরীর জন্তে যে তিনি তার প্রাণ পর্যন্ত ঢেলে দিতে পারেন!

রাজকুমারীর কাজ হ'ল শুধু মণি মুক্তো দিয়ে রাণীর জন্তে রোজ একটা করে তোড়া সাজিয়ে দেওয়া।

রাজপুরীতে রাজকুমারীর বাগানের জন্তে যে মালী ছিল সে ফুলের তোড়া তৈরী কস্বে পারত বড় সুন্দর। কাজেই ও বিছাটা রাজকুমারীর বেশ ভালই জানা ছিল।

মণিমুক্তো দিয়ে সাজিয়ে ফুলের তোড়ার মত বেশ একটা তোড়া রাজকুমারী রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তোড়া পেয়ে রাণী খুব খুসী! এত তার দাসী, একদিনের তরেও তো কেউ এমন তোড়া তাকে তৈরী করে দেয়নি!—

রাণী রাজকুমারীকে ডেকে পাঠালেন। রাণী খুসী হয়ে রাজকুমারীকে শুধোলেন—আমি তোমার তোড়া পেয়ে খুব খুসী হয়েছি—বল কি চাই তোমার?

রাজকুমারী বললেন, যদি খুসীই হয়েছেন তবে দয়া করে আপনার মাথার পদ্মরাগ মণি আমায় দিন।

মৎস্তরাণী একটু ইতস্ততঃ করলেন—কারণ ঐ মণিটা মৎস্ত-

অপল-পুল্লোস
আখী-



রাজকুমারী
বলেন—
তবে দয়া
করে
আপনার
মাথার
পদ্মরাগ মণি
আমায়
দিন ।

স্বপন-পুরী

রাজের দেয়া প্রথম উপহার, কিন্তু যখন কথা দিয়েছেন—তখন আর উপায় নেই।

মণি পেয়ে রাজকুমারী রাণীর কাছে বিদায় নিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলেন। বুড়ো মন্ত্রী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—আমার মান রক্ষা করেছ মা—নইলে দেশে গিয়ে কি আর আমি মুখ দেখাতে পারতাম ?

তারপর পদ্মরাগ মণির পরশ পেয়ে রাজপুত্রের বাঁধন আপনি খুলে গেল। খবর পেয়ে রাজা ছুটে এলেন।

রাজকুমারীর মুখ পানে চেয়ে রাজা বল্লেন, মা তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছ আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিনি—চল মা—আমার ঘরে চল।

রাজকুমারী নীচু হয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিয়ে মুছকি হেসে বল্লেন—কিন্তু বাবা—আমি অর্ধেক রাজহ আর রাজকন্যের বদলে—শুধু রাজপুত্রটাকে চাই।





রাজপুত্রের বিয়ে !

ভাট ছুটেছে দেশ বিদেশে : মঙ্গলদেশে, কলিঙ্গদেশে—উত্তরে,
পূবে, দক্ষিণে, পশ্চিমে—কোনদিকে বাদ নেই ।

রাজপুরীতে আনন্দের হাট বসে গিয়েছে । রাজা আজ
দাতাকর্ণ ; যে যা চাইছে—চু'হাত ভ'রে তা' নিয়ে হাসি মুখে ঘরে
কিরে যাচ্ছে ।

অন্দর থেকে রাণীর আদেশে মন্দিরে মন্দিরে পূজো দেয়া
হচ্ছে—ধর্মশালার গরীব দুঃখী প্রজারা পেট ভ'রে খাচ্ছে আর
আঁচলে বেঁধে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে ।

উত্তরের দূত কিরে এসে রাজাকে জানালে, খুব হুন্দরী
একটা মেয়ে পাওয়া গেছে, উত্তরে—বহুদূরে বাহুকরের দেশে ।

স্বপন-পুরী

মেয়েটির জোড়া সুন্দরী নাকি কোনো দেশে নেই। দেশ বিদেশের রাজা মহারাজারা তাকে পাবার জন্য আকুল।

রাজা বল্লেন, তা' তুমি আমার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করে এলে না কেন ?

দূত প্রণাম করে বল্লেন—তাকি আমি চেষ্টা করিনি মহারাজ ? আমি যাদুকরের সাক্ষাৎ পাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তার পুরীর ভেতর ঢুকতে পারিনি।

রাজা বল্লেন—কি করে তবে যাদুকরকে খবর পাঠানো যাবে ?

দূত বল্লেন মহারাজ, যাদুকরের বাড়ীর আশে পাশে সাত দিন ধরে ক্রমাগত ঘুরে বোড়িয়েছি। কিন্তু কিছুতেই যাদুকরের সাক্ষাৎ পাইনি, আর কি করে যাদুপুরীতে ঢুকতে হবে তাও ঠাহর কর্তে পারিনি।

রাজপুত্র ধীরে ধীরে উঠে বল্লেন—বাবা, নিজেই আমি যাদুপুরীর খোঁজে যাব—অনুমতি দাও।

রাজা হেসে বল্লেন—তুই কি পারবি রে ?

রাজার পায়ের ধূলো নিয়ে রাজপুত্র উত্তর দিলেন, শুধু তোমার আশীর্ব্বাদে আমি জগতে যে কোন কাজ কর্তে পারি।

রাজা বল্লেন, পারিস্ যদি তো আমার কোন আপত্তি নেই।

রাজপুত্র আবার রাজার পায়ের ধূলো নিয়ে যাত্রার আয়োজন কর্তে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে দূতকে

স্বপন-পুরী

গোপনে ডেকে শুধোলেন—আচ্ছা, কি করে যাদুপুরীর ভেতরে যাওয়া যায় তা কিছু শুনেনিচ্ছিস্ ? দূত উত্তরে বললে, তাতো কিছু শুনিনি—তবে কোনো রকমে একবার ভেতরে ঢুকে যাদুকরের বোকে মা বলে ডাকলে নাকি কাজ উদ্ধারের জন্য আর বেগ পেতে হবে না।

দূতের কাছ থেকে যাদুপুরীর রাস্তাটা মোটামুটি জেনে নিয়ে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়লেন।

রাজপুরী থেকে বেরুতেই মন্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র হেসে বললেন—বন্ধু, যাদুপুরীর সন্ধানে যাচ্ছি—যাবার সময় দেখা হ'ল ভালই। আবার কত দিন বাদে দেখা হবে কে জানে ?

মন্ত্রীপুত্র শুধোলেন—যাদুপুরী কেন ?

রাজপুত্র বললেন, সে অনেক কথা—ফিরে এসে বলবো।

মন্ত্রীপুত্র হেসে বললেন, আর কিছু বলতে হবে না—আমি সব বুঝে নিয়েছি, যাক—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। রাজপুত্র অবাক হ'য়ে বললেন—সে কি ভাই ? তুমি আমার জন্তে কষ্ট পেতে যাবে কেন ? মন্ত্রীপুত্র বললেন, সে সব শুনছিনে আমি। যাবই আমি তোমার সঙ্গে।

রাজপুত্র আর কি করেন ! দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। যেতে যেতে তারা গিয়ে যখন একটা বনে পৌঁছুলেন তখন সন্ধ্যা হব-হব।

স্বপন-পুরী

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন—বন্ধু, আজ এই বনেই রাত কাটানো যাক।

খুব সকালে রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙলো—মন্ত্রীপুত্র তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। রাজপুত্র ভাবলেন—আমার জন্মে বন্ধু কন্ট করে কেন সেই যাদুপুরী যাবে? তার চেয়ে আমি পালাই—ঘুম থেকে উঠে আমায় দেখতে না পেয়ে বন্ধু নিশ্চয় বাড়ী ফিরে যাবে। এই না ভেবে রাজপুত্র পা টিপে টিপে খানিক দূর এসে—এক্কেবারে এক ছুটে বন পেরিয়ে গেলেন।

চলতে চলতে রাজপুত্র যখন এক সরোবরের তীরে এসে পৌঁছলেন—তখন ঠিক দুপুর।

সেই সরোবরে স্নান করে বন-থেকে-আনা ফল খেয়ে রাজপুত্র আবার চলতে শুরু করলেন।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস কর্তে কর্তে রাজপুত্র যাদুপুরীর দিকে এগিয়ে চললেন।

সূর্য্যি মামা যখন পশ্চিম আকাশের পথে পথে ফাগু ছড়াতে ছড়াতে অস্তাচলের ধারে এসে তার আলোর জাল গুটিয়ে নিলেন—ঠিক সেই সময় রাজপুত্র যাদুপুরীর সামনে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে পুরীর চার পাশটা ঘুরে এলেন। উঁচু লোহার দেয়ালে পুরীটি ঘেরা, কোথা দিয়ে যে তার সদর দরজা তা কিছুই ঠাহর কস্তে পাল্লেন না।

ইঠাৎ রাজপুত্রের মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। তিনি তাড়া-

—ଆଦୁ କହେଇ ଗୋଟିଏ—



স্বপন-পুরী

ভাড়ি এক সন্ন্যাসীর বেশ পরে যাদুপুরীর সামনে যে বট গাছ তার তলায় বসে রইলেন। যারা ওপথ দিয়ে যেতো আসতো এই তরুণ সন্ন্যাসীটিকে দেখে খাবার ফলমূল, এমনি সব অনেক-কিছু দিয়ে যেতো। তাতেই রাজপুত্রের কোন রকমে চলে যেতো। কিন্তু তিনি কোন রকমেই পুরীতে ঢোকবার পথ ঠাহর কন্তে পাল্লেন না।

এই রকম করে দিন সাতেক কেটে গেল। রাজপুত্র বসেই আছেন।

একদিন দুপুর বেলা রাজপুত্র বটগাছ তলায় বসে আছেন হঠাৎ যাদুপুরীর ভেতর একটা হট্টগোল আর কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পেলেন। পুরীর দিকে চাইতেই দেখেন সেই লোহার দেয়ালের ভেতর একটা স্তূড়ঙ্গের মত দেখা যাচ্ছে এতদিন পরে ঐঙ্গিত বস্তুর দেখা পাওয়াতে রাজপুত্র যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন অমনি একটা অশ্বরের মত জোয়ান লোক এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে নিয়ে স্তূড়ঙ্গ পথ দিয়ে ছন্দ করে বেরিয়ে আকাশ পথে মিলিয়ে গেল। রাজপুত্রের চোখ ঝলসে গেল।

কিন্তু তখন আর বিবেচনা করবার সময় নেই, রাজপুত্রও এই অবসরে ছন্দ করে স্তূড়ঙ্গপথে ঢুকে গেলেন। ঢুকেই দেখেন চারদিকে দাসদাসীরা ছুটো-ছুটী কচ্ছে আর একটি স্ত্রীলোক আছড়ে পড়ে কাঁদছে। রাজপুত্রের হঠাৎ মনে হ'ল এ নিশ্চয়ই

স্বপন-পুরী

যাছুকর-পত্নী। যেই মনে হওয়া অগ্নি তাঁর কাছে গিয়ে শুধোলেন—“মা আপনি কঁাদছেন কেন ? আপনার কি বিপদ আমার বলুন—আমি প্রাণ দিয়েও তার প্রতিকার কর্বে। স্বীলোকটি ওপরের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন—কে তুমি বাছা আমার মা ব’লে ডাক্ছ ? আমার যে বিপদ প্রাণ দিয়েও তুমি তার কোন প্রতিকার কতে পার্বেনা, আর তোমার এই কচি বয়েস তুমি কেন বাছা আমার জন্তে প্রাণ হারাতে যাবে ?

রাজপুত্র বল্লেন, আপনি কিছু মাত্র সঙ্কোচ কর্বেন না। কি বিপদ আমার বলুন—আমি তার প্রতিকার কতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব—আর আমার বিশ্বাস এতে কৃতকার্যও হবে।

যাছুকর পত্নী শুরু করলেন, আমার এক মেয়ে আছে—পরমা সুলক্ষ্মী মেয়ে ; দেশ বিদেশের রাজপুত্রেরা তাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত। নাম তার কাঞ্চনকুমারী। শুদ্ধ নামে নয়—গায়ে তার কাঁচা সোনার রং। আমার স্বামী একজন বড় যাছুকর। আমাদের পাশের রাজ্যও এক যাছুকরের। একদিন ঐ যাছুকর এসে আমার স্বামীকে জানালো সে আমাদের মেয়েকে বিয়ে কতে চায়। কিন্তু আমার স্বামীর ইচ্ছে নয় যে ওর সঙ্গে কাঞ্চনের বিয়ে হয়। প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়ায় যাছুকর সেই দিন

শাদুকরের ঘোষে—



রাজপুত্রের চোপ কলসে গেল ।

৪৩ পৃষ্ঠা

কাজ সাহিত্য মন্দির ।

[শিল্পী: প্রসন্ন দেবদত্ত ঘোষ ।

স্বপন-পুরী

থেকে ভয়ানক রেগে গেল—আর তখন থেকে তার একমাত্র কাজ হ'ল কি করে কাঞ্চনকে হাত করে।

কিন্তু আমাদের সাবধানতায় সে কিছুতেই সুবিধা কন্তে পারেনি। আজ স্বামী বাড়ী নেই দেখে সুবিধা পেয়ে আমাব কাঞ্চনকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

যাদুকর পত্নী কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রাজপুত্র বল্লেন, কোন ভয় নেই আমি যাচ্ছি, এক্ষুণি আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। এই বলে রাজপুত্র যাদুপুরী থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় যাদুকর এসে পৌঁছলেন।

সমস্ত ব্যাপার শুনে যাদুকর ত্রীকে শুধোলেন একে ? যাদুকর পত্নী বল্লেন, এই ছেলেটা আমায় মা ব'লে ডেকেছে, আর ব'লেচে সে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।

এত দুঃখেও যাদুকর হেসে বল্লেন—পাগল ! তুমি কি করে তাদের সঙ্গে পারবে ? সে যখন কাঞ্চনকে নিয়ে তার পুরীতে ঢুকেছে তখন তাকে উদ্ধার করা শক্ত হবে। মহাবীরের যাদু বড় শক্ত যাদু।

রাজপুত্র মরিয়া হ'য়ে বল্লেন—কি কন্তে হবে বলুন—আমি তার উদ্ধারের জন্তে সব কন্তে পারি—না হয় আমি প্রাণ দেবো।

যাদুকর খুসী হ'য়ে বল্লেন—বেশ তুমি আমার সঙ্গে এসো, যাদু বিদ্যার মন্ত্র সব শিখিয়ে দিচ্ছি।

স্বপন-পুরী

কল কৌশল আর খবরাখবর সব জেনে নিয়ে রাজপুত্র চলেই সেই মহাবীর বাত্মকরের সন্ধানে ।

রাজপুত্র যখন মহাবীরের পুরীর কাছে পৌঁছুলেন তখন রাত্তির হয়ে গেছে অনেক । বাত্মকর-পত্নীর-দেয়া খাবার খেয়ে সে রাত্তিরটা তো এক রকম গাছের তলায়ই কেটে গেল । পরদিন সকাল বেলায় উঠে রাজপুত্র একবার মহাবীরের পুরীর চারপাশটা ঘুরে এলেন ।

তোরণ দ্বারের সামনেই মস্ত বড় এক চাকা, আর চাকার ভেতরের ফলাগুলো এক একটা ধারালো তলোয়ার । চাকাটি দিন রাত্তির ঘুরছে বন্-বন্-বন্ । মানুষ তো দূরের কথা সামান্য পোকা মাকড়েরও তার ভেতর দিয়ে ঢোকবার সাধ্য নেই ।

তুদিন ক্রমাগত ঘুরেও, মহাবীর কোথা দিয়ে পুরী থেকে বেরোয় আর কোথা দিয়ে ঢোকে তা রাজপুত্র কিছুই ঠাহর কতে পালেন না ।

রাজপুত্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ।

সেদিন রাত্তিরে ভয়ানক গরম পড়েছিল । সারারাত ঘুম না হওয়ায় রাজপুত্র মহাবীরের পুরীর সামনে পায়চারী কচ্ছিলেন—এমন সময় হঠাৎ সেঁ। সেঁ। শব্দ শুনে তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন । কিছুবাদে দেখলেন মহাবীর কোথেকে ঝুপ করে পুরীর তোরণ দ্বারের কাছে নেমে পড়লো । তারপর

স্বপন-পুরী

তিনটা ভুড়ি মারতেই চাকাটা থেমে গেল। চাকার কাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাবি এনে তোরণ দ্বারটা খুলে ফেলে মহাবীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। চাকা আবার ঘুরতে লাগলো—বন্-বন্-বন্।

রাজপুত্রের আনন্দ দেখে কে ? তিন লাফে এগিয়ে এলেন তিনি তোরণ দ্বারের কাছে। তারপর যেমনটা দেখেছিলেন—ঠিক তেমনি করে ঢুকে পড়লেন তিনি পুরীর ভেতর।

ভেতরে ঢুকেই রাজপুত্র এক ধাঁধায় পড়ে গেলেন, যে দিকে চান শুদ্ধ রাশি রাশি অঙ্ককার যেন তাঁকে গ্রাস করতে খেয়ে আসে। এতদূর এসে বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁকে ফিরে যেতে হবে ? কক্ষণো না। পূর্ণ উত্তম তিন বেরোবার রাস্তা খুঁজতে লাগলেন। ইঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যাদুকরের শেখান একটা মন্ত্র যা দিয়ে অনায়াসে অঙ্ককার দূর করা যায়। ব্যাস ! যেমনি মনে হওয়া তেমনি কাজ। মন্ত্রটি উচ্চারণ করা মাত্র সেই সূচীভেদে অঙ্ককার দিনের আলোর মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল—আর রাজপুত্র ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেই অঙ্ককূপ থেকে।

কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলেন একটা সিড়ি বরাবর নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। তিনি সেই সিড়ি ধরে নেমে গেলেন।

সেখানে যেয়ে যা দেখলেন—তাতে তো তার চক্ষু স্থির ! কাঞ্চন কুমারীর সমস্ত শরীরটা একটা বাস্তব ভেতর পুরে

স্বপন-পুরী

শুধু মাথাটা বাইরে রেখে তাল বন্ধ করে রেখেছে আর তার দুচোখ থেকে বর বর জল পড়ে গাল দুটি ভেসে যাচ্ছে।

রাজপুত্র ছুটে তার কাছে গিয়ে বলেন, যদি বাঁচতে চান শিল্পির আমার সঙ্গে চ'লে আসুন। কাঞ্চন কুমারী তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন আপনিই বা কে ? আর আমি এর ভেতর থেকে বেরোবই বা কি করে ?

রাজপুত্র বলেন—কে আমি তা পরে জানতে পারবেন—এই বলে এক চাড় দিয়ে বাস্র ভেঙ্গে ফেলে কাঞ্চন কুমারীর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। মহাবীরের তোরণ দ্বার পেরিয়ে আসতেই দিনের আলো তাদের দুজনকে স্নান করিয়ে দিলে। এইবার রাজপুত্র কাঞ্চনের মুখের দিকে চাইলেন। কাঞ্চনের মুখ লাল হয়ে উঠল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে রাজপুত্র পেছন ফিরে দেখেন মহাবীর ছুটে ছুটে তাদের দিকেই আসছে।

রাজপুত্র চক্ষের পলকে যাদুকরের শেখানো মন্ত্রে কাঞ্চন-কুমারীকে নিয়ে আকাশে উঠলেন; মহাবীরও আকাশ পথে তাঁদের তাড়া করল। কিছুদূর গিয়ে রাজপুত্র দেখলেন চারদিক থেকে দলে দলে সব জন্তু জানোয়ার তাদের তাড়া করে আসছে। কিন্তু মন্ত্রের জোরে তাঁদের সব হটিয়ে দিয়ে রাজপুত্র কাঞ্চনকে নিয়ে যাদুকরের পুরীতে এসে পৌঁছলেন। পুরীতে আনন্দের কোলাহল উঠল! যাদুকর-পত্নী ছুটে এসে কাঞ্চনকে বুকে নিলেন।

শাদুকরের মেয়ে—



রাজপুত্র পেছন ফিরে দেখলেন—মহাবীর ছুটে ছুটে
তাদের দিকেই আসছে।

স্বপন-পুরী

ভাল একটা দিন দেখে, যাহুকর, কাঞ্চনকুমারীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দিলেন।

রাজপুত্র যাহুপুরীতে থাকেন আর যাহুকরের কাছে সব যাহু-বিজ্ঞা শেখেন। এ রকম করে গেল বছর তিনেক।

একদিন রাজপুত্র যাহুকরের কাছে গিয়ে বলেন—বাড়ীর জন্ত আমার মন কেমন কচ্ছে; বাপ মাকে কতদিন দেখিনি—আমি বাড়ী ফিরে যাব।

যাহুকর হেসে বলেন—বেশ তো বাড়ী যাবে এতো বেশ ভাল কথা। কাঞ্চনকেও নিয়ে যাবে তো? রাজপুত্র মাথা নীচু করে বলেন—হাঁ।

তিন বছর পর রাজপুত্র কাঞ্চনকুমারীকে নিয়ে দেশে যাত্রা করলেন। কাঞ্চনকুমারীর সঙ্গে ছোট্ট একটা শুকপাখী। দলে দলে লোকজন আর বিয়ের যৌতুক সব চল্লো তাঁদের পেছ পেছ।

এক দিনের পথ যাবার পর তাঁদের হঠাৎ মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা। মন্ত্রীপুত্র হেসে বলেন—বন্ধু আমি যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছি।

রাজপুত্র তাকে নিজের রথে তুলে নিয়ে—আগাগোড়া সব বলেন। রথ দেশের দিকে ছুটে চল্লো।

আদ্যেক পথে গিয়ে একটা পাহাড়ের নীচে তাঁরা তাঁবু

স্বপন-পুরী

গাড়লেন। রাজপুত্রের সৌভাগ্য দেখে মন্ত্রীপুত্র হিংসায় বেন ফেটে যাচ্ছিল। সেই দিন বিকেলবেলা রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র বেড়াতে বেড়াতে পথের ধারে একটা মরা বাঁদর দেখতে পেলেন। মন্ত্রীপুত্রের মাথায় এক দুর্ঘট বুদ্ধি এলো।

মন্ত্রীপুত্র শুধোলে আচ্ছা বন্ধু, তুমি তো অনেক বাছুবিছা শিখে এয়েছো, এই বাঁদরটা বাঁচাও দেখি। রাজপুত্র বলেন— এ আর বেশী কি? এই না বলে—নিজের দেহ ছেড়ে তাঁর আত্মাটা বাঁদরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন, অমনি বাঁদরটা লাফিয়ে উঠল—আর রাজপুত্রের দেহটা মাটিতে পড়ে রইল। এই দুর্ঘট মন্ত্রীপুত্রও এ বিঘ্নে জানতো, রাজপুত্র যেই বাঁদরের ভেতর ঢুকেছেন, অমনি স্বেযোগ বুঝে নিজের দেহ ছেড়ে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের দেহে গিয়ে ঢুকলেন। মন্ত্রীপুত্রের দেহটা মাটিতে পড়ে রইল।

এই না দেখে বাঁদরটা এক লাফে পালিয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্র তখন লোকজনদের কাছে রটিয়ে দিলে যে, মন্ত্রীপুত্র সাপের কামড়ে মারা গেছে। কাঞ্চনকুমারী এর বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেন না।

কয়েক দিনের মধ্যে, তাঁরা দেশে এসে পৌঁছলেন। রাজা রাজপুত্রকে ফিরে পেয়ে কি খুসী। রাণী বৌকে আদর ক'রে ঘরে তুলে নিলেন। মন্ত্রীপুত্র দেশে এসে প্রচার করে দিলেন—

স্বপন-পুরী

যে যতটী বাঁদর ধরে দিতে পারবে—প্রতি বাঁদরের জন্তে তাকে পাঁচ টাকা ক’রে দেওয়া হবে। সকলে ভাবলে রাজপুত্রের খেয়াল !

গরীব প্রজারা পয়সার লোভে দলে দলে রাজ্যের যত বাঁদর ধরে আনতে লাগলো ; রাজপুরী একটা চিড়িয়াখানা হয়ে উঠল—কিন্তু সে বাঁদর মিললো না।

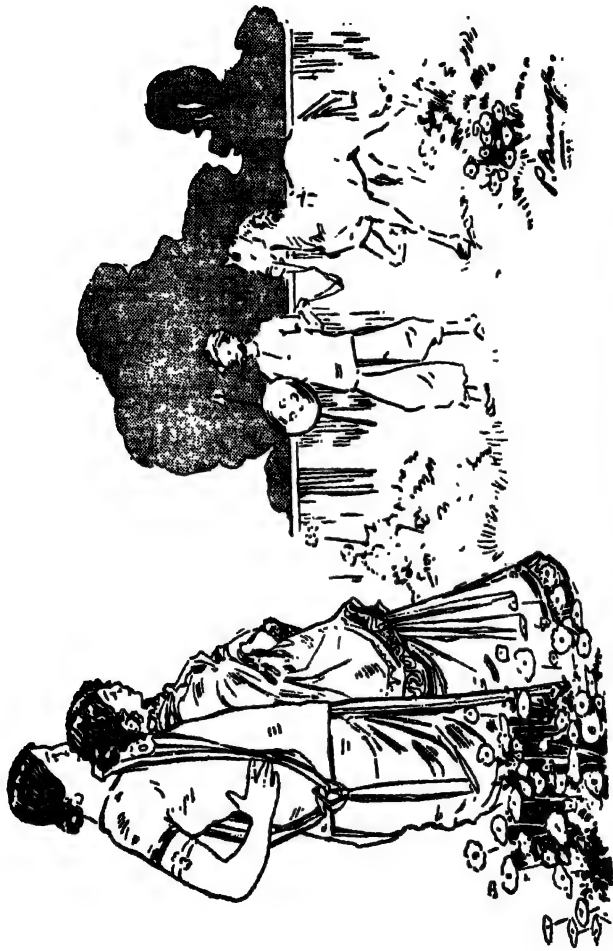
একদিন কথায় কথায় কাঞ্চনকুমারী কি করে টের পেলেন—এ রাজপুত্র নয়। তার মনে ভয়ানক খটকা লাগলো।

কাঞ্চন একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন—রোজ তার স্নান করার সময় একটা বাঁদর গাছের ডালে বসে তাঁকে দেখে—আর তিনি চলে আসতেই বানরটা কোথায় চলে যায়। মন্ত্রীপুত্র বানরটাকে ধরতে অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সে ধরা দিলে না।

কাঞ্চনকুমারী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী, তিনি সহজেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মন্ত্রীপুত্র ও কাঞ্চনকুমারী বাগানে শেত-পাথরের আসনের ওপর বসে আছেন—ইঠাৎ কাঞ্চনকুমারী দেখতে পেলেন তাদের পেছনের গাছের ওপর বানরটি বসে।

কাঞ্চন মন্ত্রীপুত্রকে শুধোলেন, আচ্ছা, তুমি বাবার কাছ থেকে যে সব যাচুবিছা শিখেছিলে সব মনে আছে তো ? মন্ত্রীপুত্র দেখলে এই তো মুশ্কিল ! তবু ভয়ে ভয়ে বলে—হ্যাঁ তা আর মনে নেই ?



বাংলায় বঙ্গের,—কেন ?—সকাল গাঁয়ে আমাদের, রথ টানবে ।

স্বপন-পুরী

রাস্তার ধারে একটা মরা ঘোড়া পড়েছিল, কাঞ্চন আগুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন—আচ্ছা ঐ ঘোড়াটাকে বাঁচাও দেখি।

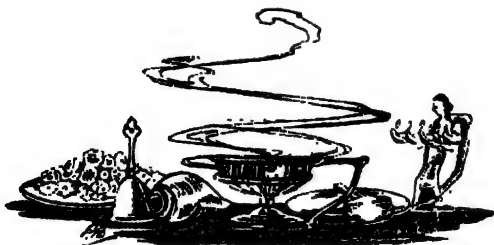
মন্ত্রীপুত্র বলে—ও-এই কথা—এই না বলে রাজপুত্রের দেহ ছেড়ে ঘোড়ার দেহে ঢুকে পড়লেন। কাঞ্চন অমনি বাঁদরটাকে ইসারা করলেন। দেখতে দেখতে বাঁদরটা মরে পড়ে গেল আর রাজপুত্র বেঁচে উঠলেন।

তখন তাদের যে কি আনন্দ হল তা আর কি বলবো ?

এই সব দেখে ঘোড়াটা দিলে একছুট ! রাজপুত্র হুকুম দিলেন, ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে এসো।

তক্ষুণি একটা প্রহরী ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো ঘোড়াকে ধরে। রাজপুত্র কাঞ্চনকে বলেন, ঘোড়াটাকে দিয়ে কি কর্বেবা ?

কাঞ্চন হেসে বলেন—কেন ? সকাল সাঁঝে আমাদের রথ চানবে।





অনেক দিনের কথা বলছি।

তখন মুক্তাপুরীর রাজা ছিলেন সত্যজিৎ। প্রজার মুখে রাজার সুখ্যাতির কথা আর ধরতনা। তাঁর সেই তেজস্বী উচু লম্বা চেহারা দেখে মাথা আপনিই নুয়ে পড়ত। বাস্তবিক রাজার চেহারা ছিল যেমন সুশ্রী, তাঁর শরীরে শক্তিও ছিল তেমনি অসীম।

তিনি যখন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে টগ্‌বগিয়ে যেতেন, কোকড়া চুল গুলো বাতাসে ছলে ছলে তার কপালের ওপর খেলা করত। লোকে প্রণাম কল্পে রাজা দু'হাত দিয়ে নমস্কার জানিয়ে হাসতে হাসতে চলে যেতেন। তারা বলা-বলি করত—সত্যি ভাই, এমন রাজা কারো হয়না।

এই রাজার ঠাকুর্দা শক্তিজিৎ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত ছিল। লোকে বলত তাঁকে দেবতার স্বর্গে ডুলে নিয়ে গেছে।

রূপের ব্যঙ্গনা—



সেই আলোর ভেতর এক দেবতার মেয়ের মূর্তি ফুটে উঠল

স্বপ্ন-পুরী

যে দেশের কথা তোমাদের বলছি সে দেশের এক দেবতার মেয়ে : রাজার শৌর্য্যে-বীর্য্যে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তাঁকে খুব ভাল বাসতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বাগানে পাইচারী কচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোক দেখতে পেলেন। রাজা বিস্মিত হয়ে আলোটির দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে সেই আলোর ভেতর এক দেবতার মেয়ের মূর্ত্তি ফুটে উঠল। দেবী বলেন, সত্যজিৎ, তুমি আমায় বিয়ে কর। তোমায় আমি স্বর্গের সোনার রথ এনে দেব। আর এমন সৌন্দর্য্য, সম্পদ তোমায় দেব, যে জগতের সব রাজারা এসে তোমার পায়ে মাথা নোয়াবে।

রাজা তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বলেন দেবি, তুমি আমায় এমন সম্পদ দিতে যাচ্ছ, যা কোন মানব স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনা কিন্তু তবু আমি তোমায় বিয়ে করতে পারিনা। কারণ তুমি দেবতার মেয়ে। এখন তুমি আমায় ভালবাসলেও এমন সময় আসতে পারে, যখন স্থগা করে দূরে ঠেলে দেবে, এমন কি তুমি আমার প্রাণ নাশও করতে পার।

রাজার কথা শুনে দেবতার মেয়ে তেলে বেগুণে ঝলে উঠলেন। কি! তিনি সেখে এসে বিয়ে করতে চাইলেন আর একটা মানুষ কিনা তাঁকে অবজ্ঞা করে ফিরিয়ে দিলে ?

স্বপন-পুরী

কোন কথা না বলে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন ।
তারপর স্বর্গে গিয়ে তার বাবাকে সব জানিয়ে বল্লেন—

বাবা, সত্যজিৎ আমার অপমান করেছে । আমি তার
প্রতিশোধ নেব ।

দেবরাজ তাঁর মেয়েকে শাস্ত কস্তে চেষ্টা করলেন । মেয়ে,
রেগে বল্লেন, আমি তাহ'লে জগতের সমস্ত লোক মেরে ফেলবো ।
আমায় এমন একটা ভয়নাক ষাঁড় তৈরী করে দিতে হবে, যে ঐ
গর্বিষত রাজাকে মেরে তার রাজ্য ছারখার করে ফেলতে পারে ।
কাজেই দেবরাজ আর কি করেন ? মেয়ের আবদার রাখতে
সত্যজিৎকে হত্যা করবার জন্য এক ভয়ঙ্কর ষাঁড় তৈরী করে
দিলেন । সে ষাঁড়ের মূর্তি দেখে দেবতার পর্ষাস্ত শিউরে
উঠলেন । জোরার মত সোনার শিং দুটি রোদে চমক্ মেরে
উঠল । তার নিঃশ্বাসের ভেতর দিয়ে আগুনের হলুকা বেরোতে
লাগলো । ক্ষুরের দাপটে ধুলো উড়িয়ে সে আকাশ পাতাল
অন্ধকার করে ফেলে ।

দেবতার মেয়ে তখনই সত্যজিতের রাজ্য ধ্বংস কস্তে ষাঁড়কে
মর্ন্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন । সেই ভয়ঙ্কর ষাঁড়, তাঁর রাজ্য এক দিক
থেকে ছারখার কস্তে আরম্ভ করে । প্রজাদের করুণ আর্ন্তনাদে
আকাশ বাতাস শিউরে উঠল । এই সংবাদ ক্রমে রাজার
কাণে পৌঁছল । প্রজাদের করুণ-কাহিনী শুনে রাজা একদিন

স্বপন-পুরী

একাকী বেরিয়ে পড়লেন—ঐ অদ্ভুত জানোয়ারটাকে হত্যা কন্তে ।

হাঁটতে হাঁটতে বহু মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় পেরিয়ে রাজা অবশেষে পৌঁছুলেন এসে মুক্তি নদীর ধারে । ঐ নদীর ধারে একটা গর্তের ভেতর জানোয়ারটা থাকতো । রাজা তাঁর যুদ্ধের বাঁশী বাজালেন !—সে বাঁশীর স্বরে নদীর জল কেঁপে উঠল । মুহূর্তের মধ্যে নিঃশ্বাসে তার আগুনের হল্কা নিয়ে—মাথা নীচু করে জানোয়ারটা রাজার দিকে ছুটে আসতে লাগলো ।

যেই কাছাকাছি এয়েছে রাজা অমনি একটু পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ের মারলেন এক কোপ ; জানোয়ারটা তাতে একটুও না দমে, তেড়ে রাজাকে মারতে এলো । রাজা তখন হাতিয়ার ফেলে দিয়ে তার শিং চেপে ধরে এমন জোরে ঘুরিয়ে দিলেন যে, তার গলাটা মট করে ভেঙ্গে গেল ।

রাজা তখন বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে ফিরে এলেন—ঘরে ঘরে আলো জ্বললো । দেবালয়ে দেবালয়ে পূজোর ঘটা পড়ে গেল । প্রজারা দু'হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ কল্লে । রাজা কিন্তু মনস্থির করে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কন্তে পাল্লেন না । দেবীর কোপানল যে নূতন আকারে তাঁকে আক্রমণ করবে এই কথা দিনে রাতে তাঁর মনের ভেতর উঁকি-ঝুঁকি মার্তে লাগলো ।

সেই রাত্রে রাজা তাঁর সাদা ধবধবে বিছানার ওপর ঘুমিয়ে

স্বপন-পুরী

আছেন—জানলার ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের আলো ঢুকে তাঁর গায়ে স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখেন—বিছানার পাশে দেবতার মেয়ে! রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায়, তার চোখ দুটি হীরের টুকরোর মত জ্বল্ছিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বলেন—সত্যজিৎ, মনে করেছ জানোয়ারটাকে মেরেই তুমি আমার হাত থেকে বাঁচবে। কিন্তু তা হবেনা। তুমি যখন কাল সকালে ঘুম থেকে জাগবে, তখন দেখবে তোমার সে সৌন্দর্য্য আর নেই। তোমার চেহারা রাত্রির মত কাল আর ভয়ঙ্কর হবে। লোকে তোমায় দেখে আঁৎকে উঠবে।

পরদিন রাজা সকালে উঠে দেখলেন—দেবীর কথা অন্ধরে অন্ধরে ফলেছে। তাঁর মাথার কোঁকড়া চুলগুলি আর নেই—দেহের স্তূঠাম মাংসপেশীগুলো ঝুলে পড়েছে—উন্নত শরীর ঝরে-পড়া নারকেল গাছের পাতার মত ন্যূয়ে পড়েছে আর তাঁর সোণার-বরণ গায়ের রং, রাত্রির মত কালো অন্ধকার হয়ে গেছে! রাজা মুকুরে নিজের চেহারা দেখে নিজেই আঁৎকে উঠলেন—বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে, প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটলেন। এ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আর তাঁর কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে রইল না। দুঃখে অপমানে তিনি নদ-নদী-প্রাস্তর পেরিয়ে আপনাকে লোকালয় থেকে দূরে—বহুদূরে টেনে নিয়ে

স্বপন-পুরী

চলেন। শেষে এক মরুভূমির ওপর দিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারময় এক স্রুঙ্গের দ্বারে এসে পৌঁছলেন।

এই স্রুঙ্গের ভেতর দিয়ে দুর্জয় পাহাড়ে যেতে হয়। বিকট লেজওয়ালা দৈত্যেরা এই রাস্তা দিন-রাত পাহারা দেয়। এই দৈত্যেরা বড় সামান্য প্রাণী নয়। তারা ইচ্ছে করলে তাদের চাউনিতে মানুষ মেরে ফেলতে পারে। পাহাড়-পর্বত পর্য্যন্ত লেজের দাপটে চূর্ণ করে দেয়।

রাজা যখন, এই অস্তুত জানোয়ারদের দেখলেন, তখন তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে তাদের মন গলে গেল। দলের সর্দার রাজার দিকে এগিয়ে এসে বললে—রাজা, আমি তোমায় এমন জায়গা বাৎলে দিতে পারি, যেখানে গিয়ে তুমি তোমার রূপ আবার ফিরে পাবে। তোমাকে স্রুঙ্গের দেশে যেতে হবে, সেই দেশে রূপের বরণা আছে। সেই বরণায় স্নান করলে তোমার চেহারা ঠিক আগেকার মতো হবে।

রাজা তার হাত চেপে ধরে বললেন “তাই তুমি আমায় বাঁচালে এখন রাস্তাটা দেখিয়ে দাও—আমি এক্ষুনি বরণার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো।”

সর্দার বললে “দেখ, অত ব্যস্ত হয়োনা। সেই দেশে যেতে হলে তোমায় বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যারা

স্বপন-পুরী

ঐ ঝরণা দেখতে গেছল—তাদের মধ্যে কেউ এ পর্য্যন্ত কিরে আসতে পারেনি। রাজা বলেন—আমি ওসব কিছু শুন্তে চাইনে—হয় আমি আমার সৌন্দর্য্য উদ্ধার করবো, নয়ত বিপদের সঙ্গে লড়ে মরবো।”

সর্দার বলে, “তোমায় দুর্জয় পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। পাহাড় ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন। যদি তুমি পাহাড় পেরিয়ে যেতে পার, তবে দেখবে সামনে এক মস্ত বন। সেই বন পেরোলে এক ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে দেখবে। সেখানে গিয়ে তুমি সমুদ্রের রাণী, দক্ষিণার কাছে সাহায্য চাইবে, তিনি তোমায় সাহায্য কত্তে পারেন।”

রাজা তাদের সাথে আলিঙ্গন করে বেরিয়ে পড়লেন—সেই রূপের-ঝরণার উদ্দেশ্যে। কিছুদূর যেতেই চারদিক থেকে অন্ধকার ঘেন তাকে গ্রাস কত্তে ধেয়ে এলো। সামনে পেছনে ডাইনে বায়ে কিছু দেখা যায় না শুধু রাশি রাশি সূঁচিভেঁজ অন্ধকার। রাজা ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বুঁজলেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার ঠাকুর্দা শক্তিজিতের কথা। তখনি তিনি হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেন। তারপরই তিনি দেখতে পেলেন—একটা আগুনের তীর তাঁর আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে চলেছে। তিনি সেই আলো ধরে অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচলেন।

স্বপন-পুরী

অন্ধকার পেরোতেই তিনি দেখলেন মস্তবড় এক বন, বিকট দৈত্যের মত দাঁত বার করে তাঁর রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্ত্ত মাত্র দেবী না ক’রে রাজা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি অবাক হ’য়ে দেখলেন থোকো থোকো হীরে, মণি, মুক্তা, জহরৎ ফলের মত গাছে গাছে ঝুলছে। মণি মুক্তা নেবার চেষ্টা না করে তিনি বহুকষ্টে বন থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়েই দেখলেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সামনে এক বিরাট সমুদ্রে। সূর্য্যের আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর পড়ে চিক্‌মিক্‌ করে ঝলছে—ভাঙছে—গড়্‌ছে। বেশ একটা মিঠে হাওয়া তাঁর গা জুড়িয়ে দিলে।

কিন্তু এখানে দেবী করবার উপায় নেই। সর্দারের কথা মনে করে সমুদ্রের রাণীকে তিনি ডাকলেন। ধীরে ধীরে রাণী দক্ষিণার মূর্ত্তি ঢেউয়ের ওপর দেখা গেল। দেবী মিঠে কথায় রাজাকে ডেকে বললেন—সত্যজিৎ, তুমি কেমন করে এই বিপদ সঙ্কুল পথে যাবে ? এই যে সাগর দেখ্‌ছ, এর পরেই মৃত্যু সরোবর। একজন মাত্র মানুষ এ পর্য্যন্ত সেখানে যেতে পেরেছে—সে শক্তিজিৎ।

রাজা বললেন,—দেবি! এই বিকৃত চেহারা দেখে আমার ওপর বিরূপ হবেন না। এখনও আমার মনে সাহস আছে। বাহুতে অস্ত্রের বল আছে। আমার বিশ্বাস, আমি কৃতকার্য্য হব।”

স্বপন-পুরী

দেবী উত্তরে বলেন—আমি শক্তিজিতের নাবিক সুদক্ষকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। যদি তার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে পেরুতে পার, কোন ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না পার, তবে মৃত্যু সরোবরে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

দেবী তিনবার সুদক্ষের নাম ধরে ডাকলেন, অমনি রাজা দেখতে পেলেন একটা কালো নৌকোর ওপর আপাদ মস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা লোক এসে হাজির হল। দেবীর পদধূলি নিয়ে সত্যজিৎ নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। দুই জনে দুই দাঁড় ধরলেন—নৌকো মোচার খোলার মত ভেসে চললো। জল—জল—চারিদিকে রাশি রাশি জল, লক্ষ ফণা তুলে নৌকোর তলে আছড়ে পড়তে লাগলো, নৌকো মোচার খোলার মত ভেসে চললো।

ক্রমাগত চল্লিশ দিন চলার পর নৌকো মৃত্যু সরোবরে এসে পৌঁছল। মৃত্যু সরোবরের জলরাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে এক ভীষণ পাকের সৃষ্টি করেছিল। পাক যেন হাঁ করে তাঁদের গিলতে আসছে। সত্যজিৎ ভাবলে এইখানেই বুঝি তাঁর জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়। কিন্তু সুদক্ষের নিপুণতায় এ কাঁড়াও কেটে গেল। দূরে তারা একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেলেন—সূর্য তখন মাথার উপর থেকে অগ্নি বর্ষণ করছিল। দ্বীপটী দূর থেকে বোধ হচ্ছিল যেন সোণালী সাগরের উপর একটুকরো পদ্মরাগমণি ভাসছে।

ক্রপোর অন্ননা—



নৌকোর উপর আপাদ মস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি লোক এসে হাজির হল ।

স্বপন-পুরী

নৌকো ভীরে এসে পৌঁছুলে তাঁরা দেখতে পেলেন আপাদ-মস্তক মণি মুক্তায় আবৃত এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এগিয়ে এসে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেন—
বৎস, তুমি অনেক কষ্ট স্বীকার করে সুখের দেশে এসেছ, যোগ্য পুরস্কার পাবে।

সত্যজিতের আর বুঝতে বাকী রইল না যে এই তার ঠাকুর্দা শক্তিজিৎ। তিনি অমনি তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলেন,—“আপনার অভয়বাণীতে আমার প্রাণ শীতল হল, দয়া করে আমায় রূপের ঝরণার কাছে নিয়ে চলুন।”

শক্তিজিৎ স্নেহ স্বরে বলেন “বাছা দীর্ঘ পরিশ্রমে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এখন তোমায় বেশ একটু ঘুমিয়ে দেহে বল করে নিতে হবে।” এই বলে তিনি, তাঁর গায় হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। ছ’ দিন ছ’ রাত্রি পর তাঁর ঘুম ভাঙল।

শক্তিজিৎ তখন তাঁকে রূপের ঝরণার কাছে নিয়ে গেলেন।

রূপের ঝরণা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! চারদিকে লতানো লতানো সব সোণালী রূপোলী গাছ আর তাতে স্বর্গের পরীরা দোল খাচ্ছে। কোকিলের তান, দোয়েলের শীষ্‌ যায়গাটাকে গানে গানে ভরে দিয়েছে। মাঝখান দিয়ে রূপের

রূপের অলস—



সত্যজিৎ তাঁর আগেকার চেহারা ফিরে পেলেন

স্বপন-পুরী

বরগার রূপোলী স্রোত কুল-কুল করে বয়ে যাচ্ছে। সত্য-জিৎকে দেখে পরীরা সব গান ধরলে।

সত্যজিৎ জলে বাঁপিয়ে পড়লেন। উঠে দেখেন তাঁর আর সে কুৎসিৎ চেহারা নেই, ঠিক আগেকার মতই চেহারা তার স্ত্রী ও বলিষ্ঠ হয়েছে। তাঁর মাথা দিয়ে দেবতাদের মত দীপ্তি বেরোতে লাগলো।

সত্যজিৎ শক্তিজিতের পদধূলি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। প্রজারা মনে করেছিল তাদের রাজা মরে গেছে। এখন তাঁকে দেখে, তাদের যে কি আনন্দ হ'ল তা তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ।





যখনকার কথা বলতে বাচ্ছি—অভ্রপুরীর রাজা ছিলেন তখন
দিখিজয়ী শত্রুদমন ।

পূব-পশ্চিমে জোড়া মস্ত বড় তাঁর সাম্রাজ্য । বড় বড়
রাজারা পর্য্যন্ত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে । তাঁর সভাসদেবাও
ছিলেন—তেমনি—বাছা বাছা—নাম করা পণ্ডিত ।

রাজা তাঁদের উপদেশ না নিয়ে কোনো কাজেই হাত
দিতেন না ।

আজ পর্য্যন্ত অভ্রপুরীর প্রজারা তাদের জ্ঞানী দয়ালু রাজার
কথা বলে দুঃখ করে থাকে ।

এদিকে হ'য়েছে কি কিছুর মধ্যে কিছু নেই—হঠাৎ একদিন
চণ্ডপুরীর রাজা অভ্রপুরীর রাজ্য আক্রমণ করে বসল । চণ্ডপুরী
অভ্রপুরীর উত্তরে ।

স্বপন-পুরী

রাজা তক্ষুণি ছুটলেন তাকে দমন করতে—সঙ্গে তাঁর ঘোড়া, রথ, অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত। অল্প কয়েক দিনের যুদ্ধেই তিনি শত্রুপক্ষকে একেবারে হটিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতাকে জানিয়ে দিলেন—রাজা শত্রুদমন দয়ালু বটেন, কিন্তু সেই সঙ্গে দুষ্কের দমনেও তিনি বেশ পটু।

কিন্তু এই বিজয়োল্লাসের পেছনে যে তাঁর জন্তে দুঃখের বোঝা জমা ছিল—তা' রাজা কিছুই টের পান নি।

যুদ্ধক্ষেত্রের উপরা-উপরি প্রায় দিন পনরোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি শয্যা নিলেন।

রাজবৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ভালো করতে পারলেন না।

রাজা ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেন। জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে আনন্দ দেবার জন্তে নানা দেশ থেকে বড় বড় কবি ও গায়কদের আনা হ'ল। তিনি কিন্তু তাঁদের সব বিদায় দিয়ে বল্লেন,—আমায় শাস্তিতে মরতে দাও—এখন আমি আর কিছু চাই নে।

অব্রপুরীর রাজপুরোহিতের কাছে দেবতাদের দেওয়া একটি সোনার বাঁপি ছিল।

রাজ্যের কোনো বিপদ আপদ হ'লে—রাজসভার মন্ত্রী, অমাত্য আর দেশের সব বড় বড় মানী লোক গিয়ে ঐ বাঁপি

সোনার নাঁপি—



রাজাকে আনন্দ দেবার জন্যে গায়ক আর কবিরা এসে কণা হ'ল।
কল্‌জা মাটি বা মন্দির। [শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ।

স্বপন-পুরী

খুলতেন, তার ভেতর তাঁরা সময় সময় দেবতাদের আদেশ দেখতে পেতেন। সেই আদেশ অনুসারেই তখন দেশের কাজ চলত।

রাজা মর-মর—রাজ্যের দুর্বস্বার সীমা নেই—তাই রাজার তিন ভাই এক সঙ্গে পরামর্শ করলেন—উপায় কি ?

দু'জন বলেন, দেবতাদের দেওয়া কোটোটি খুলে দেখলে হয় তো তার ভেতর আমরা কোনো আদেশ পেতে পারি।

তৃতীয় ভাই সত্যব্রত কিন্তু অণ্ড উপায় স্থির করলেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি একটা খোলা মাঠে চলে এলেন। সেইখানে তিনি চারটি বেদী তৈরী করালেন। একটি পূবে, একটি পশ্চিমে, একটি উত্তরে, আর একটি দক্ষিণে। দক্ষিণ বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আর উত্তর দিকে মুখ করে তিনি পরলোকগত তিন জন বড় বড় রাজার কাছে নিজের প্রার্থনা জানালেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—রাজার জীবন রক্ষার জন্ত তাঁদের কাছ থেকে কোনো না কোনো সাহায্য মিলবেই।

অন্নপূরীর ঘোষণাপত্র লিখে রাখবার জন্তে একজন লোক ছিল। লোকে তাকে লিপিকারক বলে ডাকতো।

সত্যব্রত যা' বলে যাচ্ছিলেন—লিপিকারক একটি তাম্রার পাত্রে অবিকল তাই লিখে নিচ্ছিল।

সত্যব্রত প্রার্থনা শুরু করলেন—হে মহামাণ্ড রাজগণ,

স্বপন-পুরী

তোমাদের বংশধর শত্রুদমন এখন মৃত্যু শয্যায় শুয়ে। তাঁর মঙ্গল অমঙ্গলের জন্তে তোমরাই দায়ী। যদি তাঁকে মরতেই হয়—তবে তাঁর বদলে তাঁর ভাই সত্যব্রতের প্রাণ তোমরা নাও। আমি জীবনে কারো ক্ষতি করি নি—আমার প্রার্থনা কি তোমরা শুনবে না? রাজ্যের প্রজারা রাজাকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসে। জগতে আমার কোনো বাঁধন নেই। যদি রাজ-রক্তই দেবতাদের একান্ত কামনা হ'য়ে থাকে—ত' তাঁর বদলে আমাকে নিলে তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'বে—আর রাজ্যও রক্ষা পাবে। জীবনে সত্যই যদি আমার একমাত্র ধর্ম হ'য়ে থাকে—ত' আমার প্রার্থনার জবাব যেন ঝাঁপির ভেতর পাই।

প্রার্থনা শেষ করে সত্যব্রত মন্দিরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের পদধূলি নিয়ে সব জানাতেই—সোনার ঝাঁপির চাবিটি এনে—তিনি সত্যব্রতের হাতে তুলে দিলেন। ঝাঁপিটা খোলা হয় নি—বহুদিন।

রাজা শত্রুদমনের শাসনে রাজ্যে শান্তি ছিল—দুঃখের মুখ প্রজারা অনেক দিন দেখে নি। কাজেই তাঁর রাজত্ব কালে সোনার ঝাঁপি খোলার আর কোনো দরকার হয় নি।

মন্দিরের এক অঙ্ককার কুঠুরীতে লোহার সিন্ধুকের ভেতর ঝাঁপিটা ছিল। যেই সিন্ধুকের ডালাটি তুলেছেন—অমনি সোনার

সোণার বাঁপি—



পুরোহিতের পদধূলি নিয়ে সব জানাতেই সোণার বাঁপির
চাবি এনে তিনি সত্যব্রতের হাতে দিলেন ।

স্বপন-পুরী

কাঁপি থেকে জ্যোৎস্নার মত আলো বেরিয়ে ঘরটাকে করে ফেলে
যেন—একেবারে গলা সোনার তৈরী !

সেই আলোতে সত্যত্রত দেখতে পেলেন—দেবতার। তাঁর
প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন।

আনন্দে তাঁর গা শিউরে উঠল !

কাঁপির ভেতর লেখা রয়েছে—সত্যত্রত, তোমার প্রার্থনায়
আমরা খুব খুসী হয়েছি। রাজার বদলে তোমার প্রাণের
প্রয়োজন নেই। সত্যের প্রতি তোমার আজন্ম বিশ্বাসের
বিনিময়ে আমরা শত্রুদমনকে বাঁচিয়ে দেবো। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত
তিনি রাজত্ব করতে পারবেন।

সত্যত্রত আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন। যে তামার
পাতে তাঁর প্রার্থনা লেখা হ'য়েছিল, সেই পাতটা কাঁপির ভেতর
রেখে তিনি তার মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর চাবিটা রাজ-
পুরোহিতের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন,—একথা যেন কেউ
শুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

পরদিন সকাল বেলা রাজা শত্রুদমন বিছানা ছেড়ে উঠে
বসলেন।

সকলে দেখে ত' অবাক !

* * * * *

তারপর বছর দশেক কেটে গেছে।

স্বপন-পুরী

শত্রুদমনের রাম রাজহে প্রজাদের দিন বেশ সুখেই কাটছিল—কিন্তু একদিন রাজ্যের ছেলে-বুড়ো সবাইকে কঁাদিয়ে, তিনি চলে গেলেন—ওপারের ডাকে।

যুবরাজ তরুণকুমার তখন খুব ছোট। তাই তাঁর কাকা সত্যব্রত তাঁর হ'য়ে রাজ্য চালাতে লাগলেন। কারণ বয়েসে ছোট হ'লেও তিনিই ছিলেন তাঁর কাকাদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান ও ধার্মিক। তার পরিচয় আগেও আমরা অনেক পেয়েছি।

সত্যব্রতের আর দু'ভাই কিন্তু ছোট ভাইয়ের এত সম্মান দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। দিন রাত্তির তারা ফিস্-ফিস্ করে বুদ্ধি আঁটতে লাগলো—কি ক'রে সত্যব্রতকে জব্দ করা যায়! হঠাৎ তাদের কপাল গুণে একটা ভারী সুবিধেও জুটে গেল। ব্যাপারটা হল কি—কিছুই মধ্যে কিছু নেই—হঠাৎ একদিন সুবর্ণরেখা নদীতে বান ডেকে এলো—তাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা ঘর-দোর হারিয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়ল। দেশ জুড়ে হাহাকার উঠল। দলে দলে প্রজা রাজবাড়ীতে এসে তাদের দুঃখ জানিয়ে বলল, রাজা নাবালক—দেখবার আমাদের কেউ নেই! সত্যব্রত এই সব শুনে একদিন ঘোষণা করে দিলেন, যুবরাজ নিজে বস্তার যায়গাগুলো দেখতে যাবেন।

রাজপুরীতে সাড়া পড়ে গেল। রাজপুত্র দেশ ভ্রমণে যাবেন।

স্বপন-পুরী

তখনি এক সোনার পাক্ষী তৈরী হ'ল। সৈন্ত সামন্তদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ভাল এক দিন দেখে সোনার পাক্ষীতে চেপে রাজপুত্র রাজ্য দেখতে বেরোলেন।

তু' এক দিনের ভেতরই তারা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। প্রজারা দলে দলে এসে তাদের রাজপুত্রকে দেখে যেতে লাগলো। রাজপুত্র কাউকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলেন না।

একদিন সকালবেলা রাজপুত্র লোকজন নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, কিছুদূর যেতেই রাজপুত্রের পাক্ষী দল থেকে ছট্কে অনেকটা এগিয়ে পড়ল। সঙ্গে তখন তাঁর তু'একজন অশ্বারোহী ছাড়া আর কেউ রইল না।

হঠাৎ একদল ডাকাত তাদের ওপর এসে পড়ল। সঙ্গেই লোকেরা চীৎকার করে সাহায্যের জ্ঞাত ডাকাডাকি করলে কিন্তু দলের লোকেরা তখন অনেক দূরে। ডাকাতরা অনায়াসেই তাদের হটিয়ে দিয়ে সোনার পাক্ষীর দিকে এগিয়ে চললো। সকলে হা-হা করে উঠলো। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, রাস্তার ধুলো উড়িয়ে তীর বেগে তাদের সৈন্তেরা সব ছুটে আসছে। আনন্দে তারা চীৎকার করে উঠল। সৈন্তদের দেখে ডাকাতরা সব চারদিকে সরে পড়ল! কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে এই যে একটা ঘটনা ঘটে গেল—এতে সত্যব্রতের তু'ভাই খুব সুবিধা পেল। তারা রাজ্যের ছোট বড় সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলো—

সোণার বাঁপি—



হঠাৎ একদল ডাকাত তাদের ওপর এসে পড়ল।

স্বপন-পুরী

সত্যব্রত রাজপুত্রকে হত্যা করে নিজে রাজা হবার জন্তে এই ষড়যন্ত্র করেছিল। সত্যব্রত যদি দুই লোক হতেন—তা'হলে তক্ষুণি তার ভাইদের কারাগারে কিম্বা শূঁলে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কাউকে কিছুই না বলে মনের দুঃখে চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে এক দূর দেশে। রাজ্যের ভার তার ভায়েরা পেলে।

ধীরে ধীরে হেমন্তকাল এসে পৌঁছুল। মাঠ সব শস্যে ভরে উঠল। একদিন হল কি—কথা নেই বার্তা নেই—এক প্রলয়ের ঝড় এসে শস্যের ক্ষেত সব দ'লে মুষ্ড়ে ঘর দোর ভেঙ্গে গাছ পালা উপড়ে রাজ্য তোলপাড় করে তুললো। সাতদিন সাতরাত এই ঝড় সমানে চললো। রাজ্যের প্রাচীন লোকেরা বললে—এমন ঝড় দেখাতো দূরের কথা—তারা কখনো কানেও শোনে নি।

প্রধান পুরোহিত বল্লেন—কোন কারণে স্বর্গের দেবতারা আমাদের ওপর রাগ করেছেন—এ ঝড় হ'য়েছে তারই জন্যে। রাজা বল্লেন—সোনার ঝাঁপি খুললে আমরা বোধ হয় তার ভেতর কোনও ইঙ্গিত পেতে পারি। যুবরাজ তরুণকুমারই এখন রাজা। মন্ত্রী ও অমাত্যদের নিয়ে রাজা মন্দিরে গেলেন। প্রধান পুরোহিত এসে রাজার হাতে সোনার ঝাঁপির চাবি তুলে দিলেন। অনেকদিন পরে আবার ঝাঁপির মুখ খোলা হ'ল। ঝাঁপি খুলতেই রাজা তামার পাতে লেখা সত্যব্রতের সেই প্রার্থনা দেখতে পেলেন। প্রধান পুরোহিতের দিকে ফিরে রাজা বল্লেন,

স্বপন-পুরী

—এসব কি ? এর তো কিছুই আমাকে জানানু নি ? পুরোহিত তখন তাঁকে সব জানিয়ে বল্লেন, সত্যত্রতই এই সব কথা বলতে মানা করেছিলেন। রাজা তখন অমাত্যদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—এ বাড় কেন হয়েছে—তা আর আমার বোঝবার বাকী নেই। সৈন্যদের সাজতে বলুন—আমি এখনই ছোটকাকাকে ফিরিয়ে আনতে যাবো।

সাতদিন পরে রাজা সত্যত্রতকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। ফিরেই তিনি তাঁর আর দুই কাকাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রজারা অবাক হ'য়ে দেখলে—ঝড়ের আগে তাদের মাঠ যেমন শশে ভরা ছিল—ঠিক তেমনটিই আছে। তাদের ঘরদোরের কুটো গাছটিও কেউ ভাঙে নি। সকলে দলে দলে রাজপুরীতে গিয়ে রাজাকে এ খবর জানালে।

সত্যত্রত ফিরে আসাতেই যে রাজ্যের পূর্ববন্ত্রী ফিরে এসেছে তাতে আর কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।

—শেষ—



—আমাদের প্রকাশিত—

শিশু-সাহিত্যের খানকয়েক সেরা বই

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-ভূষণের

শ্রীচৈতন্য ১/০

রঘুনাথ ১০

দশীচি ১০

কৃতবোধ ১০

মশার যুদ্ধ ১০

শ্রীকৃষ্ণদরশন ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত

ঠাকুর বাণী ১০/০

শ্রীচাক্রচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

শাহজালাল ১০

শ্রীঅমিয়কান্তি দত্ত প্রণীত

অষ্টৈতাচার্য্য ১০/০

শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত

অপন-পুরী ৫০

পরীর দৃষ্টি ১০/০

বাঘ মাঝা ১০/০

কলিকাতা ও ঢাকার সকল প্রধান পুস্তকালয়ে

আমাদের সকল পুস্তক পাওয়া যায়।

